প্রতিদান চাইনি

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতিদান চাইনি

হাসনান আহমেদ

সংবৃতি

প্রতিদান চাইনি

হাসনান আহমেদ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৬

প্রকাশক
প্রকৃতি
১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম (বেজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরাত-ই-খুদা সড়ক, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৩২৮৭২৩, ই-মেইল: prokriti.book@gmail.com

মুদ্রণ
অর্ক
৩/১, ব্লক এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৬৩৮-৫

মূল্য: ৩০০.০০ টাকা

Protidan Chaini by Hasnan Ahmed
Published by Prokriti, Dhaka, April 2016
Price: Tk. 300.00

উৎসর্গ

রুবী আহমেদকে
যাঁর ত্যাগ আমার সমৃদ্ধি

আমার কথা

কখনো ভাবিনি এ বইয়ের ভূমিকা দুবার লিখতে হবে। তাই হচ্ছে। প্রথম ভূমিকা লিখেছিলাম বিরাশি সালে, যখন বইটা লিখেছিলাম। দীর্ঘ দিনেও, বলা যায় চৌত্রিশ বছরেও বইটা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি, কিংবা প্রকাশের কথা ভাবিনি; এখন আবার তা ভাবছি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আমার প্রথম বই 'জীবনক্ষুধা'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছিলাম, 'পুরনো বই-খাতাপত্র ঘাটতে গিয়ে দুটো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেলাম– এটি তার একটি, অন্যটি উপন্যাস'। এটাই সেই 'অন্যটি'। প্রথম বইটা প্রকাশিত হবার পর আমার শুভার্থী সহকর্মীবৃন্দ, সুহৃদ বন্ধুবান্ধব এবং গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যে সপ্রশংস প্রেরণা ও সাড়া পেয়েছি, তা আমাকে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটাও প্রকাশে সাতিশয় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই এই বিলম্বিত প্রয়াস।

লেখার পরিপ্রেক্ষিত তখন আর এখন কমবেশি একই আছে, তবে পরিবেশ-পরিস্থিতি যারপরনাই অপকৃষ্ট হয়েছে। কাহিনীর প্রচ্ছন্ন প্রেক্ষাপট ছিল ছাত্র-রাজনীতি। যদিও ছাত্র-রাজনীতিকে ঘটনার মুখ্য ভূমিকায় আনা হয়নি, তবে জলছবি হিসেবে এসেছে। সে সময় ছাত্র-রাজনীতি তার অতীত গৌরবকে অনেকটা ম্লান করে দিয়ে মোটামুটি আধাআধি পচে গিয়েছিল। বর্তমানে এসে তা পচতে-পচতে গলে নিঃশেষ হয়ে শুধু দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, আর ঘিনঘিনে পোকা কিলবিল করছে। শেষ হয়েও রয়ে গেছে অবশেষ।

এ পর্যায়ে এসে লেখা ও প্রকাশনার সুদীর্ঘ ব্যবধানের সেতুবন্ধ তৈরি করতে গিয়ে আবারও ভূমিকা লিখতে হচ্ছে। সে সময়ে লেখা ভূমিকাটাও ছিল একটু ভিন্ন আঙ্গিকের, যা এখানে তুলে ধরছি–

ব্যর্থ জীবনের জটিল যন্ত্রণা হতে
তোমাদের জন্য বয়ে এনেছি যে প্রীতিমাল্যখানি,
আমার বেদনার রঙে তা রঙিন,
পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার গ্লানি থেমেছে এখানে,
যাকে নিয়ে অতি ভয়ে লাজে সংগোপনে

দিয়েছি পাড়ি এ ধরাধামে
তারই দু-একটি যে পূর্ণ অশ্রুজলে।
কুড়িয়ে সেসব ব্যথা এঁকেছি যে ছবিখানি–
তোমাদের স্মৃতিপটে রাখবে কি তা ধরে?
জীবনবীণায় বেঁধেছি যে সুর,
গেয়েছি যে গান তোমাদের তরে,
চাইনি তো কোনোদিন কোনো প্রতিদান–
তবুও দিয়েছ যে ব্যথা গাঁথতে এ-মালা
সেও তো তোমাদেরই দান,
নিয়েছি অঞ্জলি ভরে।
কোনোদিন আর যদি দীপ না জ্বলে,
বীণার তার ছিঁড়ে যায়, যদি থেমে যায় এ গানখানি,
সেদিনের সেই ক্ষণে বেলাশেষের গানখানি হয়ে যদি বাজে–
হৃদয়ের প্রতিটি কন্দরে কন্দরে, শুধু এ মিনতি জাগে–
সেদিন ফিরিয়ে দিও না আমার এ জীবন-গানখানি
নিও তুলে আপনার করে।
তবে আমার আর কোনো অনুযোগ না-রবে
শুধু এই ভেবে– জীবন পাতার দিনগুলো আমার
হয়ে র'লো পাথেয় ভবে।

ঢাকা, এপ্রিল ২০১৬

(হাসনান আহমেদ)

প্রতিদান চাইনি

১.

অতীতের যত ভুল, পাপ
বুঝে এখন করি অনুতাপ
মনে হলে দুঃখ আনে
তবুও তারে রেখেছি অতি সংগোপনে।
যেদিন ফেলেছি হারিয়ে,
পাব কি তারে দুহাত বাড়িয়ে!
সব কিছু বৃথা ভাবনা
সেদিন আর আসবে না,
ফেলে এসেছি যারে
দুঃখ আর করবো নারে,
মিছে শুধু ভবের মাঝে
বেলা গেল ঘিরলো সাঁঝে।

নীরবতা ভেঙে আমি বলে উঠলাম– দাদু তারপর?

এতক্ষণে দাদু যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। গোপন অশ্রুকে গোপনেই মুছে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন। শরতের অপলক জোছনায় পৃথিবী যেন স্তব্ধ-বিমূঢ়; প্রাণের স্পন্দনও যেন থেমে গেছে। শুধু দাদুর ইতিবৃত্তগুলোই চারদিকে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কত কথাই না আজ মনে পড়ছে। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই, কালগর্ভে সবই বিলীন হতে চলেছে। শুধু একটি কথাই প্রতিভাত হচ্ছে– পৃথিবীর এ মঞ্চে কে কার খবর

রাখে! সবই আপন আপন গণ্ডিতে আবদ্ধ, আর সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। জীবনে কী চেয়েছে, কী পেয়েছে গুনতে গুনতেই চলে আসে পরপারের ডাক। তারপর মায়া কাটানোর পালা। যে যত তাড়াতাড়ি ব্যথা কাটিয়ে কর্মকে বরণ করে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান, লাভের অংশ তারই বেশি। পৃথিবী বিদায়ী যাত্রীর খতিয়ান কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়ে হিসেব চুকিয়ে ফেলে। হিসেবে জের থাকলেও তা টানার প্রয়োজন পড়ে না। খুলতে হয় নতুন খতিয়ান, আবার চলতে থাকে হিসেব। এভাবেই জগৎ চলছে। কত নাম-না-জানা ডাক, কত ভাবের আবেগ, কত পাওয়া না-পাওয়ার আকুল কান্না, কত বিরহ, কত উচ্ছ্বাস সবই মা মাটির বুকে বিলীন হয়ে গেছে, আর সাক্ষীগোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী, ছুটে চলেছে সময়। এমন কারো নিতান্ত ইচ্ছে হয় না– ব্যথিতের ব্যথা একটু দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনি, সমবেদনা প্রকাশ করি। সময়ের অতিক্রমণে অনেক কিছুই মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে। আজ যা একান্ত সত্য, আগামীকাল তা সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রতীয়মান হয়। তাই এ বয়স পর্যন্ত নির্ঘাত সত্য বলে যা একান্ত জানি, তা নিতান্ত মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

দাদু বলে চললেন– সেবার কলেজ ছেড়ে সবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলাম। গ্রামের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরিবেশ, দালান-কোঠা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হতে লাগলো। এই সাথে বার বার আরেকটা কথা স্মৃতিপটে ভেসে আসতে লাগলো যে, খবরের কাগজে চোখ রাখলেই মোটা মোটা অক্ষরে লেখা যে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা প্রায়শই চোখে পড়ে, সে কি এই সুন্দর পরিবেশের অভ্যন্তর ভাগের কাহিনী? এই পরিপাটি সাদা বস্ত্রের আবরণে কি সেই জিঘাংসা ঢাকা পড়ে আছে? কিছুদিন যেতে না যেতেই বোধ করতে লাগলাম কখন জানি অজান্তেই মনের উপর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কথায় ও আচরণে বেশ কিছুটা শহুরে বনে গেলাম। যে কেউ দেখে সমস্বরে আর 'গেঁয়ো' কথাটা উচ্চারণ করার জো রইলো না। দু-চার মাস পর বাড়ি ফেরার সময় বাস থেকে নেমে যে দু-এক মাইল পথ পায়ে হাঁটতে হয় তা যেন অসহ্য হয়ে উঠতে লাগলো। সবচেয়ে বেশি যেটা পীড়া দিত তা হলো, শীতের আগমনে গ্রামের পথে ধুলোর বাড়াবাড়ি। ধুলো দেখলেই যেন শরীরের মধ্যে একটা নাক-সিঁটকানো ভাব ফুটে উঠতো।

সুযোগ মতো 'ন্যাস্টিক' কথাটাও উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করতাম না। বাল্যকালে যে এই ধুলোকে কতই-না আপন জেনে, গায়ে মেখে, রাস্তায় গড়িয়ে ভূত সেজে সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে বাড়ি ফিরেছি। সে সময় মায়ের দেয়া উপহার– দু-চারটে কিল যে পিঠে পড়তো না এমন নয়, এসব কথা সবই যেন ভুলে গেলাম। প্রথম বর্ষ যে কেমন করে কোন রোমাঞ্চের মধ্য দিয়ে শেষ করেছিলাম মনে নেই। তবে এ সময় হলে সিটের যেমন টানাটানি, তেমনই পড়াশোনার অবহেলা। ভর্তির পর আমার এক দূর-সম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছে নিতান্ত আপদ হয়ে উপস্থিত হলাম। লজ্জার কারণেই হোক আর সহানুভূতির জন্যই হোক, তিনি আমাকে ডাবলিং করার অনুমতি না দিয়ে পারলেন না। তবে তার অনার্স পরীক্ষা সমাগত হওয়ায় বিকেল সাড়ে চারটায় কমনরুমে প্রবেশ ও রাত দশটার সময় বের হয়ে রুমের দিকে পা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। মাঝখানে একবার ডাইনিং থেকে খেয়ে নেয়া। পাছে এমন কথা হয় যে, আমার কারণে তাঁর পরীক্ষা খারাপ হয়েছে– এই ভেবে আমি এ পথ বেছে নিয়েছিলাম। সত্য বলতে কি, এ দায়িত্ববোধটুকু অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বলতে যা বোঝায়, তা ছোটবেলা হতেই আমার মধ্যে নাকি ছিল বলে অনেকে বলতো, এর কতটুকু সত্য তা প্রমাণ করার বা ভাবার সময় আমার জীবনে কখনোই হয়নি।

দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হলাম। আমাদের হলে নাকি ভূতের আড্ডা আছে, বন্ধু মহলে প্রায়শই এ কথা শুনতাম। তাছাড়া ইতিপূর্বে একটি ছেলে নাকি হল থেকেই মারা গেছে এবং সে-যে ভূতের পাল্লায় পড়েই, এ কথাও অনেকে ফলাও করে বলতো। লাশ দেখার সৌভাগ্য কিন্তু আমার হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সিট পুনর্বণ্টন করা হলো, এবারও বাদ পড়ে গেলাম। ১০৪ নম্বর রুম এক-শয্যাবিশিষ্ট। যার নামে বণ্টন করা হলো সে জীবনের এত অল্প বয়সেই ভূতের পাল্লায় পড়ে প্রাণবায়ু নির্গত করবে না আশ্বাস দিয়ে দুই-শয্যাবিশিষ্ট রুমেই রয়ে গেল। আমি বাবার সৌভাগ্যবান পুত্র বলেই হোক, আর অসমাপ্ত জীবনের সমাপ্তির জন্যই হোক, যা সারাটা জীবন আমাকে কাঁটার মতো সমস্ত হৃদয়কে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছে, শূন্য রুমে স্থান গেড়ে বসলাম। দিন যেতে লাগলো। স্বাধীনতার আস্বাদন পেয়ে সম্পূর্ণ পড়ুয়া বনে গেলাম।

২.

সেবার গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ট্রেন-স্টেশনে উপস্থিত হলাম। সহসা ভিড়ের মধ্য থেকে একটা চেহারা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। এক-পায়ে এক-পায়ে এগিয়ে গেলাম। মনে হতে লাগলো এই মুখের মতো মুখ যেন দরজা ঠেলে ক্লাস রুমে প্রবেশ করতে দেখেছি– ইনিই কি তিনি? মনের মধ্যে কৌতুহল।

বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম– ভাই, আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন?

উত্তরে বললেন– জি।

আমার বুঝতে বাকি রইলো না যে, ইনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়েন না, আমার ক্লাসেও পড়েন।

–আপনিও নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন? হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার প্রতি পাল্টা প্রশ্ন।

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সময়মতো ট্রেন এলো। কিছুদূর যেতে না যেতে পরিচয়ের পালা এসে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম– আপনার নামটা জানতে পেলে খুশী হব।

উত্তর এলো– মুস্তফা কামাল চৌধুরী। তবে বন্ধুমহলে কামাল নামেই পরিচিত।

কথা প্রসঙ্গে তিনি যে শহরে এক আত্মীয়ের বাসায় থাকেন এবং দু-চার দিনের মধ্যে আত্মীয়ের অন্য শহরে পোস্টিংয়ের কারণে হলে এসে ভর করতে হবে– তাও জানাতে বাদ দিলেন না।

কামাল ও আমি সামনাসামনি বসে আছি। আমি কথা বলছি আর ফাঁকে-ফাঁকে তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। দেখলাম, বিধাতা তার সমস্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যর কিছুটা কাজে লাগিয়ে, বেশ রংঢং করে, খুবসুরত দিয়ে মানুষটাকে গড়েছেন।

সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে ট্রেন থামার কিছুক্ষণ আগে তার সাথে থাকা বিছানাপত্র আপাতত আমার রুমে রেখে দেয়ার জন্য অনুরোধ

করলেন এবং এখন তিনি আত্মীয়ের বাসায় যাবেন বলে জানালেন। আগামীকাল বিকেলে হলে এসে তার এক বন্ধুর রুমে বিছানাপত্র নিয়ে যাবেন এবং হলে সিট না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন– এ আশ্বাসবাণীও আমাকে শোনালেন। ট্রেন থামলে উনি ব্যাগ ও বিছানাপত্রগুলো নামাতে সাহায্য করলেন। অতঃপর আমি রিক্সা ডাকতে যেতে উদ্যত হলে রিক্সাভাড়াটা আমার হাতে দিয়ে সৌজন্য দেখাতে চাইলেন। আমি সসম্মানে বাধা দিলাম। বিদায়ের সময় মুচকি হাসির একটা ধন্যবাদ যে কপালে জুটলো না, তা নয়। হলে চলে এলাম।

পরদিন বিকেল বেলা কয়েক বন্ধু মিলে হলের সামনে ঘাসের উপর বসে গল্প জমিয়েছি। এমন সময় কামাল এলেন। কেমন আছে জানতে চেয়ে তাকেও বসালাম। অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমার অনুমতিসাপেক্ষে তিনি যে আগামী দশ-বারো দিন আমার রুমেই থাকতে পারেন এ কথা বুঝলাম। তাছাড়া তিনি যে সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার জন্য অনেক কারেন্ট ডাটা সংগ্রহ করেছেন এবং বেশ নোটপত্র জোগাড় করেছেন তাও জানালেন। আমি সন্তুষ্টচিত্তে রাজি হয়ে গেলাম। মনে মনে এও ভাবলাম যে, এমন একটা ভালো ছেলে কিছুদিন রুমে থাকলে নোটপত্র করার ব্যাপারে অনেক সাহায্য জুটবে। সন্ধ্যায় দুজনে রুমে এসে বসলাম। দুজনের গ্রামের বাড়ি, পারিবারিক জীবন, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশ আলাপচারিতা হলো। মাঝে রাতের খাবার খেয়ে এলাম। গল্পে গল্পে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

পরদিন সকাল হতেই গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটু গভীর দৃষ্টিপাত করলেই মনে হয় আকাশ যেন কী এক অজানা শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। তারই কারণে আকাশ একাধারে অশ্রুনিপাত করে চলেছে। দুজনে নাস্তা শেষ করে এলাম। পড়ায় আদৌ মন বসলো না। এমন দিনে পাশে না জানি কার অভাব বার বার বোধ করতে লাগলাম। এটা মনে হয় বয়সের ভালোলাগা, বয়সের ধর্ম। 'তারে কি বলা যায় এমন দিনে' মনে হতে লাগলো। কিন্তু এমন কপালপোড়া দুঃসহ জীবনে কেউ যে কোনোদিনই দুঃখের ভাগ নিতে আসবে না, নিশ্চিত ভেবে কামালের সাথেই গল্প করতে লাগলাম। গল্প করতে করতেই এক পর্যায়ে কখন যেন মন

দেয়া-নেয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। তাকে অতি আপন এবং কাছের বন্ধু ভাবতে পেরেছি। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে যে বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটেনি এমন নয়, তবে প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা হাতে গোনা দু-একজন। এই যেমন 'রমা' আমার বাল্যবন্ধু। এ জীবনে তাকে ভোলা কঠিন। বাকি সবাই চলার পথে ক্ষণিক সঙ্গীর মতো– কেউবা 'কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলে পাজি' প্রবচনের বাস্তব প্রয়োগ। কিংবা কেউ কেউ নামমাত্র বন্ধু। কারো কারো সাথে কোনো বিষয় নিয়ে এমন মতানৈক্য হয়েছে যে, সে যা সানন্দে বরণ করে নিচ্ছিলো, আমি তা শুনে বা দেখে শিউরে উঠেছি কিংবা ঘটনায় আমার মনটা ঘৃণায় ছি ছি করে উঠেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই সে সঙ্গ থেকে নীরবে বিদায় নিয়েছি। তবুও হাল না ছেড়ে কামালের সঙ্গে আবার হৃদয়ের ঘনঘটা পাকিয়ে বসলাম। বলে রাখা দরকার যে, এই এক দিনের মধ্যেই কখন যে মনের অজান্তে 'আপনি' থেকে সম্পর্ক 'তুমি'তে এসে ঠেকেছে তা ঠাওর করে বলতে পারিনে।

বললাম– কেন জানি যে-কেউ একটু হাস্যোচ্ছলেই হোক বা মিনতির ছলেই হোক আবদার করলে আর ফেরাতে পারিনে। তাছাড়া যে-কোনো গরীব, দুঃখী, নিঃস্ব দেখলে বড্ড মায়া লাগে, মনটা যেন তার সেই ব্যথায় আবেগাপ্লুত হয়ে যায়– কেন এমন হয়?

কামাল বললো– আমারও তো ঐ একই অবস্থা।

তাছাড়া ওর অনেক কথা আমার মনের সাথে হুবহু মিলে গেল। রুচি, নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনা অনেক কিছুই মিললো। ভাবলাম, মনের মতো মানুষ এইবার পেলাম। জীবনের একতারায় আবার নতুন তার বাঁধলাম। আবার এলো নতুন সুর, নতুন গান। কয়েক দিনের মধ্যে কামালকে বিশিষ্ট বন্ধু জেনে মনে মনে চিন্তার জাল বুনতে লাগলাম। সময় বুঝে দুজনে, সাধারণত বিকেলে নির্জন কোনো মাঠে গিয়ে বসে গল্প করতাম। ও নিজে ওর জীবনেতিবৃত্ত শোনাতো, আমিও আমার একান্ত অনেক কথা বলতাম। মাসখানেকের মধ্যে দুজনে হরিহর আত্মা হয়ে গেলাম। এখন আর কামালকে ছাড়া কোনো কথা চিন্তাও করতে পারিনে। এমনই করে দিন চলতে থাকলো।

ক্লাস থেকে ফিরে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে দুজনে শুয়ে আছি। পিয়ন একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। লেখা আছে, 'ফাদার সিরিয়াস, কাম শার্প'। কামাল আমাকে স্টেশন পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে গেল। আমি ট্রেনে চাপলাম। বাড়ি আসার দুদিন পর আব্বা ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। সমাধিস্থ করার পর ভগ্ন হৃদয়ে অসহায়ের মতো বাড়ি ফিরে এলাম। বুঝলাম, এবার আমাকেই সংসারযুদ্ধে নামতে হবে। অনেক চিন্তার জাল বুনে নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিলাম, আশ্বস্ত করলাম। 'অকূল পাথারে খোদা তুমিই ভরসা মম' বুঝ মেনে নিলাম। মনের অজান্তেই কখন টেবিলের উপর পড়ে থাকা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলাম–

হে চলন্ত পথিক আজ কেন তুমি
হয়ে আছো শান্ত?
ফুরিয়ে গেছে কি পথ?
ও পথেও তুমি আজ চলন্ত পান্থ।
দুদিনের খেলাঘর, দুদিনের পথযাত্রী,
হয়েছে দিবাবসান, ঘনিয়ে এসেছে রাত্রি।
ক্ষণিকের ছায়া মানসপটে আঁকি,
ক্ষণিকের মায়া ধরাতলে রাখি–
নিলে চিরবিদায়,
সহসা এলো মুখে–
চলে গেনু অতি বড় দুঃখে,
ধরাতলে থাকতে আর না চাই।

৩.

কয়েক দিন পর হলে ফিরে গেলাম। কামাল এবং বন্ধুরা খবরটা শুনে সমবেদনা প্রকাশ করলো। দু-একজন যে দু-একটা হিতোপদেশ দিল না এমন নয়, সব কিছুই নত মস্তকে গ্রহণ করলাম। কেন জানি এরপর থেকে কামালের সাথে বন্ধুত্ব গভীর থেকে গভীরতর হয়ে গেল। এভাবে একটা

রুমে দু-জনের তিনটা মাস কেটে গেছে। এতদিনে কামালের সিটের ব্যবস্থা অন্য একটা হলে হয়ে গেল। বিদায় নেবার পালা এলো। জন্মাবধি যার সাথে আগে কোনো সাক্ষাৎ নেই, মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে সামান্য কোয়ার্টার মাইল দূরে কামালকে ঠেলে পাঠাতে কেন জানি মনটা বার বার ব্যথাতুর হয়ে উঠতে লাগলো। শেষে নিজে সাথে গিয়ে বিছানা পেতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম। প্রিয় ব্যক্তিকে বিদায় দেয়া, এমনকি বিদায়ের কথাটা উচ্চারণ করা যে কত কঠিন ও কষ্টদায়ক, সে একমাত্র ব্যথিত ছাড়া কেউই বোঝে না। আমিও জীবনে এই প্রথম বুঝলাম। বাতাসের মধ্যে থেকে আমরা মাঝে মাঝে বাতাসের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠি, মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসাকে অনেকেই বুঝতে অসমর্থ হই। আজকে কামালের ভালোবাসা যেন মা-বাবার ভালোবাসার চাইতে বেশি বলে প্রতীয়মান হতে লাগলো। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সময় পেলেই কামালের রুমে গিয়ে তাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম। কামালও মাঝেমধ্যে আমার রুমে আসতো। দুজনে বাইরে বেরোতাম, বেড়াতে যেতাম, খেতাম। দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। সাবসিডিয়ারি পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। কয়েক দিনের জন্য হলেও দাঁড়বিহীন সংসার নৌকায় হাল ধরে বসলাম।

কদিন বাদে একদিন বিকেলে কামাল আমাদের গ্রামের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। মনটা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। দুজনে মাঠের বড় পুকুরটার ধারে বেড়াতে গেলাম। পশ্চিম দিক থেকে যে খালটা এসে পুকুরের সাথে মিশেছে তার পাড়ে বসলাম। পুকুরের চারদিকের মাঠে সবেমাত্র সরষে ফুলের আগমন হয়েছে। ফুলের সমারোহ সমস্ত মাঠকে হলুদ রঙে একাকার করে তুলেছে। ফুলের কানে কানে ভ্রমর গান গেয়ে যাচ্ছে। অপরূপ দৃশ্য! পাশে খালের ধারে পাঁচ-সাতটা খেজুরের চারাগাছ। তিন-চার বছরের সাক্ষ্য বহন করে একে অন্যের বাহুর উপর বাহু রেখে কতই না মনের কথা বলছে! বোঝার মতো অনুভূতি থাকলে সে ভাষা নিশ্চয়ই বুঝতাম। সূর্য ডুবুডুবু। সূর্যের শেষ রশ্মি সরষে ফুলের রঙে রঙ মিশিয়ে আমাদেরকে অনুভূতির এক অজানা জগতে নিয়ে গেল। কথায় কথায় কামাল আমার হাতে হাত রেখে কথা দিল– যতদিন বেঁচে থাকবো আমাদের এ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। শুধু কয়েকটা খেজুরের চারাগাছ, অস্তপ্রায়

সূর্য, আর পুকুরের নীরব-নিথর কালো জল এ প্রতিশ্রুতির সাক্ষীগোপাল হয়ে রয়ে গেল। সেদিন বন্ধু বলতে বিদেশী ভাষার 'ফ্রেন্ড' না বুঝে বাঙালি হৃদয়ের অকৃত্রিম বন্ধু কাকে বলে তার স্বরূপ অনুধাবন করলাম এবং বন্ধুর প্রয়োজনে নিজেকে বিলিয়ে দিতে শিখলাম। সেদিন আর নিজেকে নিয়ে একটুও ভাবিনি– শুধু কামালকে নিয়েই ভেবেছি। ওর উন্নতিতে আমার শান্তি এবং তার অশান্তি আমার বেদনা।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আমাদেরকে অন্ধকারে ঢেকে ফেললো। আমার শুধু এ কথাই ভাবনার সীমান্তে দোল খেতে লাগলো যে, পাঁচ-সাতটা চারা খেজুরগাছ যে চার-পাঁচ হাত জায়গা ঘিরে একে অন্যের উপর হেলে পড়ে যেভাবে বাহুবন্ধনে নিজেদের আঁকড়ে ধরে দিনাতিপাত করছে, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের মাঝখানে কিছুটা মাটি সরিয়ে দুজনায় চিরনিদ্রায় ঢলে পড়তে পারলে তৃপ্তি পেতাম এবং এর মতো শান্তি মনে হয় কিছুই হতো না। ওর হাতের স্পর্শে কল্পনা জগৎ থেকে সম্বিত ফিরে পেলাম, দুজনে উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পরের দিন সকালে কামাল আবার আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বাড়িতে চলে গেল।

চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ঠিকমতো সবসময় হয়ে ওঠে না। তারপর রেজাল্ট আউট হয়েছে। হলে গেলাম, কামালও দেখি এসেছে। এবার ও আমাকে ওর হলে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। কামালের সান্নিধ্যের কথা মনে করে আমার আর আপত্তি রইলো না। নতুন হলে এসে সবার মাঝে নতুন হয়ে গেলাম। সিট পেতে দেরী হবে বলে কামালের সাথে ডাবলিং করতে লাগলাম।

হলে এসে এই কয়েক মাসের ব্যবধানে কামাল পুরোদমে ছাত্ররাজনীতিতে বহাল হয়ে গেছে এবং সে যে ছোটখাটো একটা নেতা বনে গেছে এ কথাও এখানে এসে অন্যান্য ছেলেদের কথায় বুঝতে পারলাম। কামালের কথাবার্তায়ও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। দিনে দিনে রুমটা পার্টির কার্যালয়ে পরিণত হলো। সব সময় হল পর্যায়ের ছোট-বড়-মাঝারি নেতা-কর্মীদের সমাগমে রুমটা পরিপূর্ণ থাকতো। মাঝে মধ্যে ভার্সিটি পর্যায়ের নেতাদেরও আসতে-বসতে এবং বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করতে দেখতাম। দলীয় আদর্শ, নৈতিকতা, রাষ্ট্রীয় কল্যাণ, গণমানুষের মুক্তি ইত্যাদির কথা কখনো

কানে আসতো না, বরং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, কে কীভাবে বড় নেতার সান্নিধ্যে যাবে, কীভাবে মাঠ দখল করা যাবে, কোথায় কীভাবে সভা করতে পারলে, কী কথা বলতে পারলে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে– এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম।

হাইস্কুল পর্যায় থেকে 'পার্টি ইজ দ্য ম্যাডনেস অব মেনি ফর দ্য গেইন অব এ ফিউ' কথাটা জানতাম এবং যুদ্ধোত্তর সময়ে বাস্তবে সচক্ষে প্রয়োগ হতে দেখেছিলাম, তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যথাসম্ভব পরিহার করতাম। কিন্তু মনে মনে যে একটা আদর্শ চিন্তা ও চেতনা ধারণ করতাম না, তা নয়। রাজনীতিতে সক্রিয় ছাত্রদের সুবিধাবাদী চরিত্র, অনৈতিক কীর্তিকলাপ, মিথ্যাচার, পেশিশক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি আমার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতো। একটা জিনিস বার বার লক্ষ্য করতাম, যে কর্মী প্রকাশ্য দিবালোকে বিরোধী পক্ষের দু-চারজন কর্মীকে বিনা দ্বিধায় নির্মমভাবে হত্যা করতে কিংবা বিষয়বস্তু থাকুক আর না থাকুক রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বক্তৃতা দিতে পারতো, তাকেই পরের দিন অনেকের মুখে বড় মাপের নেতা বলতে শুনতাম। এগুলো আমার মনে ঐতিহ্যবাহী সোনালি ছাত্ররাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন-পরিণতির রূপরেখা বলে মনে হতো। আর স্লোগান বলতে সুর ধরে নাচতে নাচতে এবং হাতে তালি দিতে দিতে কয়েকটা হল প্রদক্ষিণ করাকে বোঝাতো। আমি কিন্তু এ ধরনের তালি দেয়া স্লোগানকে নৃত্যগীত বলেই বুঝতাম। স্লোগানের সাথে এই হাততালির কোনো সাযুজ্য এবং মাহাত্ম্য কিছুই খুঁজে পেতাম না। যাদের হৃদয়ে দেশাত্মবোধের লেশমাত্র দেখতাম না, যারা স্বকীয় আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু পার্টিতে বহাল হয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার পথই অন্বেষণ করতো, তাদের দিয়ে যে গণমানুষের কল্যাণ ও মুক্তি আসতে পারে না এই ভেবে রাজনৈতিক স্লোগানে যোগ দিতাম না বটে, তবে কামালকে ছেড়ে দূরেও থাকতে পারতাম না। আবার তাকে ছাত্ররাজনীতি থেকে ফেরাতেও পারতাম না। কোনো কোনো দিন কামালের রুমে ফিরতে দেরী হলে আমার পড়ার টেবিলে মন বসতো না, অজানা আশঙ্কায় গেটের সামনে রাস্তায় পায়চারী করতাম। একাকী যখন চিন্তা করতাম তখন বেশ ভালোই বুঝতাম যে, কামাল বলতে মনের মাঝে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা রয়ে গেছে। আর নামটা মনে হতেই হৃদয়ের

সমস্ত মায়া যেন উপচে পড়ার উপক্রম হতো। মনের মধ্যে কী যেন এক শুকনো অনুভূতি এদিক-ওদিক দৌড়ে ফিরতো।

ভালোই বুঝতে পারলাম যে, আমি কামালকে ভালোবাসি। কিন্তু এ ভালোবাসা যে চাওয়া-পাওয়া এবং জীবনসঙ্গী করে ঘরবাঁধার স্বপ্ন নয়, তাও জানি। তাছাড়া এ ভালোবাসা যে নিঃস্বার্থ, প্রতিদানহীন ও এ-জগতে দুর্লভ এবং আমি একাই যে এ ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবো না, সে দায়িত্ব যে উভয়েরই তা নিশ্চিত জেনেও পিছপা হবার পথ খুঁজে পেলাম না। দেখলাম, এ জগতে যাকে ভালো লাগে, মনের কাছে যে সুন্দর– শুধু সে-ই সুন্দর, সে-ই সমস্ত গুণের অধিকারী! নিজেকে দূরে রাখলেও মনকে দূরে রাখা যায় না, সদাসর্বদা যেন তারই চারপাশ ঘিরে কল্পনার জাল বুনতে থাকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজনীতির মারপ্যাচে পড়ে, অস্বাভাবিক পরিবেশকে স্বাভাবিক করার অজুহাত দেখিয়ে এবং জীবনের শেষ বিদ্যাপীঠকে পুরোপুরি যথোপযুক্ত উপভোগ করানোর জন্য তিন বছরের অনার্স পরীক্ষা পিছিয়ে পিছিয়ে চার-সাড়ে চার বছরে ঠেকিয়ে দিল। পরীক্ষার আর মাত্র ছয় মাস বাকি।

৪.

আমি অবস্থা দেখে এবং এখানে থাকলে পরীক্ষার প্রস্তুতি আদৌ হবে না জেনে, গ্রামের বাড়িতে এসে প্রস্তুতি নেব স্থির করলাম। আসার সময় কামালকে অনুরোধ করে আমার সাথে থেকে পড়াশোনা করার জন্য জোর দিলাম। হলে থাকলে তার পড়াশোনার যে হাটে-হরিবোল অবস্থা হবে এবং পরীক্ষার খাতায় যে বড় বড় গোলাকার মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছুই জুটবে না, বুঝতে পেরে কামাল আমার কথায় রাজি হয়ে গেল। বন্ধুর শুধু কল্যাণ কামনাই নয়, তাকে অন্ধকূপ থেকে টেনে উঠানোর দায়িত্বও যে আমারই, তা ভেবে এ পথ বেছে নিলাম। কামাল আমার এখানে এসে পড়াশোনা করবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে হলে রয়ে গেল, আমি বাড়ি চলে এলাম।

দুই মাস পর কিছু বইপত্র নিয়ে কামাল আমার বাড়িতে উপস্থিত হলো। পরের দিন দুজনে মিলে বাড়ি থেকে দু-তিন মাইল দূরে হাইওয়ে সংলগ্ন এক

বাজারে এলাম এবং বাজারের পূর্বপ্রান্তে স্থানীয় একটা অফিসের বিচ্ছিন্ন একটা নিবিড় রুমে আশ্রয় নিলাম। বাজারের এক হোটেল মালিকের সাথে কথা বলে খাবারের ব্যবস্থা করা গেল।

আমি বাড়ি আসার পর এ দুমাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে কামালের সাথে কোনো এক অবলার যে মন নিয়ে রীতিমতো টানা-হেঁচড়া আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সে এই ক্ষুদ্র বাজারে আসন গাড়লেও মনের আসন যে শত শত মাইল দূরে কোনো এক নারী হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঠাঁই খুঁজে ফিরছে, তা কিছুটা প্রেমিক সেজে কামাল মনের আনন্দে হেসে জানালো। আমি যেন তা সানন্দে বরণ করে নিলাম এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম– এই সৌভাগ্যবতী দেবীটি কে, জানতে পারি কি?

ও বললো– মেয়েটির নাম রুনী। গত দুমাস হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য এসেছিল। আমি ভোটের তালে ব্যস্ত থাকায় ভর্তির ব্যাপারে ওর কোনো সময় দিতে পারিনি, তবুও এই ছাত্রজীবনের শেষ বেলায় শেষের গানখানি হয়ে একটা সুর হৃদয়কন্দরে বেজে উঠলো। আগে ওর সাথে আমার পরিচয় ছিল না তা নয়, আমাদের একটা পরিচিতি ছিল। মাঝে মধ্যে রসিকতার ছলে দু-একটা কথা ছোড়াছুড়ি হয়েই রয়ে গিয়েছিল, এর বেশি নয়।

কথাগুলো বলে কামাল আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে মুচকি হেসে উঠলো। আমিও একটু হাসলাম।

ও আবার বলে চললো– প্রথম প্রথম ও আমার হলে এলেও গত বিশ-পঁচিশ দিন থেকে বিকেল তিনটার দিকে ওকে নিয়ে ক্যাম্পাসের উত্তর প্রান্তে সাদা-সাদা দালানগুলোর ফাঁকে ফাঁকে, সবুজ ক্ষেতের মাঝে প্রতিনিয়ত যে প্রাণের মেলা বসে সেখানে যেতাম। কখনো লাইব্রেরির পাশে সবুজ বনানীতে গিয়ে বসতাম। দুদিন যেতে না যেতে সমস্ত বাধা, লজ্জা এবং নিজস্বতা হারিয়ে দুজনে এক হয়ে গেলাম। কথা দিলাম রুনী তোমাকে নিয়ে ছোট্ট নীড় রচনা করবো, সে নীড়ে আমি হব রাজা আর তুমি হবে প্রাণের রাণী। রুনী আমাকে ধরে চোখের স্বপ্নীল চাউনীতে তার একান্ত সম্মতি বুঝিয়ে দিল। এভাবে প্রতিদিন আনন্দ মেলায় যোগ দিতে লাগলাম কিন্তু তোমার চিঠিতে না এসে পারলাম না।

কথাগুলো বলে কামাল একটু থামলো, তারপর নোটবুকের মধ্য থেকে একটা কাগজ বের করতে করতে বললো– এই দেখো, তার নিজ হাতে লিখে দেয়া ঠিকানাটা। এখানকার ঠিকানা দিয়ে তাকে লিখতে হবে।

আমি তৎক্ষণাৎ তা কামালের হাত থেকে নিলাম। একদৃষ্টিতে ঠিকানাটা দেখলাম, তারপর হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলাম। কামাল আমার ভাব কিছু বুঝতে না পেরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। কেন হাসলাম কারণ জিজ্ঞেস করায় বললাম– এমন মেয়েকে মন দিয়েছ যে তোমাকে দেয়া ঠিকানাটা লিখতেও ভুল করেছে।

কামাল একটু হাসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো– কী ভুল হয়েছে?

আমি বললাম– রুনী-র 'র' এর ফোটা আসেনি এবং উ-কারের 'উ' চোখে পড়ছে না, ফলে 'রু' হয়ে গেছে 'ব', অর্থাৎ নামটা 'বনী' হয়েছে। যার বিশেষ্য করলে দাঁড়াই 'বনীকরণ' অর্থাৎ এক কথায় 'এফরস্টেশন'। এখন দেখছি তোমার মনকেই সে করেছে ক্ষেত্র, আর সেখানে রোপণ করেছে চারা, ফলে তোমার ক্ষেত্রটা একদিন পরিণত হবে একটা বনাঞ্চলে। বলো দেখি, কিসের চারা রোপণ করেছে তোমার মনের ক্ষেত্রে? প্রেমের, না বিরহের?

ও বললো– এত ব্যাখ্যাও দিতে পারো তুমি প্রতিটি কথার। তোমার সাথে আর পারা যাবে না দেখছি, ট্যালেন্ট হয়ে গেছ ।

আমি বললাম– জীবনে ট্যালেন্ট আজও দেখোনি, তাই সামনে যাকে পাও তাকেই ট্যালেন্ট বলে চালিয়ে দাও। ট্যালেন্ট যারা তাদের যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। খোঁজ করো গিয়ে গাছের তলায় কিংবা প্লাটফরমে। আমাদের মতো বেশি কথা বলে না, অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকে।

– আরে, সে তো পাগল। কথাটা বলে কামাল হেসে উঠলো। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললো– চলো খেয়ে আসি।

দুজনে খেতে চলে গেলাম।

রাতে এসে কামাল আমাকে না বলেই ঘটনাটা লিখে রুনীকে জানিয়েছে। আট দিন পরে যখন উত্তর এলো, তখন কামাল চিঠির মাঝখানের তিনটি

লাইন আমাকে পড়ে শোনালো। লেখা আছে– 'তোমার বন্ধুর লেখা খাতাগুলো উল্টিয়ে দেখো, এর চেয়েও অনেক বড় বড় ভুল চোখে পড়বে।' কথাগুলো পড়ে কামাল হাসলো। মনে হলো যেন রুনী জিতেছে, তাই সেও জিতলো। অর্থাৎ চিরাচরিত নিয়মের আর ব্যতিক্রম দেখলাম না। একটু পরে একটা প্যাডে কলম ধরলাম। লিখলাম–

ভাবী,

শুভেচ্ছা নিও। ছোট্ট ভুল হতেই যখন পরিচয়, তখন ভুলক্রমে 'ভাবী' ও 'তুমি' বলে সম্বোধন করলাম, ত্রুটি মার্জনীয়। ভুল মানুষের হয়ে থাকে বটে কিন্তু প্রেমের ঠিকানায় ভুল হলেই তো মারাত্মক। তবে কি এ প্রেমটা শুধুই ভুল, না নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে? উত্তরের প্রত্যাশায়–

দেবর 'সুজন'

দিন চলতে লাগলো। রুমটাতে ছটি প্রাণীর বসবাস। আমরা দুজন। একটা ভেন্টিলেটরে দুটো শালিক, অন্য আরেকটাতে দুটো চড়ুই। তাদের বসবাস অবশ্য বাচ্চা প্রতিপালনের লক্ষ্যে, আমাদের অধ্যয়ন। আমি বিরতির সময়ের জন্য বন্ধুত্ব কথাটা রেখে দিয়ে বাকি সময় কামালের গৃহশিক্ষকের পদে বহাল হয়ে গেলাম। আমার কাঁধে তিনটা দায়িত্ব পড়লো। প্রথম দুটো হলো নোটপত্র করা এবং কামালকে অংকের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে বুঝিয়ে দেয়া। অন্যটা হলো রাত দশটা না বাজতেই কামাল যখন পড়ার টেবিলে বসে দুই চোখ মুদে মাথাটা একবার এ-দিক, একবার ও-দিক করে ঢুলে ঢুলে বইকে সেলাম করতো, তখন তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনমতো ধাক্কা দেয়া। সাতদিন পার হয়ে গেল, পরের দিন একটা রঙিন খামে রুনীর দেয়া চিঠি পেলাম। খামের মধ্যে দুটো পৃষ্ঠা– একটা আমার, অন্যটা কামালের। আমার চিঠিতে লেখা–

সুজন ভাই,

শুভেচ্ছা নেবেন। একটা ভুলের মধ্য দিয়ে আপনার মতো একজন দেবর পেয়ে সত্যিই ধন্য হলাম। এখানে থাকাকালীন কামাল সব সময় আপনার কথা বলতো। সেই থেকেই জানতাম আপনি কামালের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ঠিকানায় যখন ভুল, গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবো কিনা জানিনে। তবে

ভুলের সংশোধন যেহেতু আপনিই করলেন সেজন্য সঠিক পথের দায়িত্বও আপনার উপর রইলো। আশা করি মেনে নেবেন। চিঠির উত্তর দেবেন।

'ভাবী'

চিঠিটা পর পর দুবার পড়লাম। বুঝলাম, জন্মাবধি পরের চিন্তায় চিন্তিত হওয়া যার দৈনন্দিন কাজ, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া যার স্বভাব, গাছে গাছে নতুন পাতার আগমন যার হৃদয়ে বয়ে আনে পুলক-আনন্দ, ঝরা পাতার মর্মর বেদনা যার হৃদয়কে করে তোলে ব্যথাতুর, এমন লোকটাকে চিনতে রুনী একটুও ভুল করেনি।

দিন যায় রাত আসে। এমনই করে এই নিভৃত ঘরটাতে দুজনে মাস পাড়ি দিতে চলেছি। এতদিনে বেশ কয়েকখানা চিঠি রুনী লিখেছে। সবগুলোতেই মিশে আছে মিনতির সুর।

একদিন আমি আর কামাল কয়েক দিনের জন্য ভার্সিটিতে গেলাম। সংবাদ পেয়ে পরের দিন রুনী আমাদের রুমে এলো। কামাল আমাকে রুনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এ পরিচয় নতুনের পরিচয় নয়, নামের সঙ্গে মুখের পরিচয়। এ পরিচয়ে কেউ কারো নাম উচ্চারণ করেনি, জানতে চাইনি তার বাড়ি কিংবা নেই কোনো সৌজন্যতামূলক কথাবার্তা। দীর্ঘ এক মাস ধরে সম্পূর্ণ অজানা জগতে কোনো এক নারীর কয়েকখানা চিঠি থেকে তার মনের যে ভাবটুকু ফুটে উঠেছে এবং সেই সঙ্গে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ কল্পনা করে ঐ নারীমূর্তিটির যে ছবি এঁকেছি– এ পরিচয় ছিল সেই অঙ্কিত ছবির সাথে আসল ছবির পর্যবেক্ষণ। তাই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মুখে ফুটে ওঠেনি কোনো হাসির ছটা কিংবা গল্পের ঘনঘটা। তার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে মৌনতা, ভাবগম্ভীরতা এবং এমনি আরও অনেক কিছু। বিকেল চারটার দিকে তিনজনে বাইরে বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। উল্লিখিত সেই আনন্দমেলায় যোগ দিলাম। একটা উঁচু ঢিবির উপর তিনজন পাশাপাশি বসে আছি। আজ আনন্দমেলার এই অংশে ছোট্ট ঢিবির উপরে নেই প্রেমিকের প্রেমদৃষ্টি, নেই মুচকি হাসি, নেই কোনো গোপন চুম্বন। কামাল যেন সম্পূর্ণ নতুন, একাকী। আজকের গল্পের নায়ক কামাল নয়, আমি। আজ এখানে না আছে কোনো রসিকতা, না আছে উচ্ছ্বাস– সেখানে ভিড়

জমেছে নতুন প্রেমের দীর্ঘ একমাস কামালকে দূরে রেখে কাছে পাওয়ার প্রবল বাসনার সেই অভিব্যক্তি। এ সময়ে ছাদে উঠে শত শত মাইল দূরে অজানা কোনো এক নিভৃত ঘরের কোণে কামালের বসে থাকা মুখটিকে কল্পনা করে দিগন্তের পানে চেয়ে থাকার সেই করুণ স্মৃতি কিংবা উভয়ের জীবন বইয়ের খসে পড়া পাতার চোখের জলে ভেজা অস্পষ্ট কাহিনী।

এতদিন শুধু কামালকেই বন্ধু জেনে একান্ত আপন ভাবতে শিখেছিলাম কিন্তু আজ আর শুধু কামাল নয়, রুনীকেও ঐ একই ডোরে গাঁথলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রুনীকে ওদের হলগেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আমি ও কামাল হলে ফিরলাম। সন্ধ্যার পর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে কামাল রুমে বিভিন্ন রসিকতার গল্পে হাসির ফোয়ারা বইয়ে তুললো। সে হাসিতে না আছে কোনো ক্লেদ, না আছে কমনীয়তা। আমার মনের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। বার বার রুনীর মুখচ্ছবি হৃদয়পটে ভেসে আসছিল, আর মনে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল তার বলা সেই ফেলে আসা জীবন কাহিনীর দু-একটা শব্দ। তাই আড্ডায় যোগ না দিয়ে বালিশে মাথা রেখে অজানা জগতে তলিয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, জীবনে বেশ কিছু ছেলের প্রেমে পড়ার কাহিনী শুনেছি, তাদের হাবভাব লক্ষ্য করেছি, পরিবর্তন দেখেছি কিন্তু কামাল যেন তাদের থেকে স্বতন্ত্র। প্রথমে কামালকে মধ্যবিত্ত ঘরের এক আদর্শবাদী ছেলে হিসেবে দেখেছিলাম, বন্ধু হিসেবেও সেভাবে নিয়েছিলাম, কিন্তু যতই দিন সামনের দিকে যাচ্ছে কামাল ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, সুচতুর হয়ে উঠছে। টাকা কামাই এবং নিজের বৈষয়িক উন্নতির দিকটাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, সে যেন কৌশলী মহা-রাজনীতিবিদ হয়ে উঠেছে। এসব পরিবর্তনে দীর্ঘ আড়াই বছর যা দেখেছি ও পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে কামাল আমাকে শুধু ভাবুক করে তুলেছে। কোনো গভীর দুঃখ কিংবা কোনো আবেগ কামালকে আর দুর্বল করতে পারছে না, স্পর্শ করছে না তার হৃদয়। তাই কয়েক দিন আগের ভাবমিশ্রিত একান্ত কাছে পাওয়ার করুণ আকুতিভরা রুনীর চিঠিও কামালের হৃদয়ে কোনো ঝড় তোলেনি, ভাবনায় আসেনি রুনীর প্রতি কোনো আবেগ কিংবা কোনো সহানুভূতিভরা চিন্তা। দেখেছিলাম চিঠি পড়ে কামাল শুধু একটু মৃদু হেসেছিল, আর কিছু নয়।

আজও সামান্য আধ-ঘণ্টার ব্যবধানে ভুলে বসেছে রুনীর বলা করুণ ইতিবৃত্ত, সৃষ্টি করেনি তার মনে কোনো ভাবমিশ্রিত অনুভূতি– তাই সে এখন এক নতুন জগতে। এ যেন সৃষ্টিকর্তার তুলনাবিহীন এক অনন্য সৃষ্টি।

পরের দিন, সকাল সাড়ে নটা। হঠাৎ হলের অফিসের দিক থেকে গোলযোগের সুর ভেসে আসতে লাগলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ডাইনিং হলের হিসাব নিয়ে হিসাবরক্ষক ও হাউজ টিউটরের মধ্যে কথা কাটাকাটি ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। এখন এই নিয়ে কিছুসংখ্যক ছেলে দুদলে বিভক্ত হয়ে জটলা পাকিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছে। অতীতের কোনো এক ঘটনা নিয়ে প্রাধ্যক্ষ সাহেব হাউজ টিউটরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং এ পরিস্থিতিতে প্রাধ্যক্ষ সাহেব হিসাবরক্ষকের পক্ষ নিলেন। বুঝলাম, এখানেও শিক্ষক রাজনীতি আছে। হাউজ টিউটর সাহেব ছিলেন আমাদের বিভাগেরই একজন জুনিয়ার শিক্ষক, তৃতীয় পত্র পড়ান। আমি রুমে ফিরে কামালকে রুমে নিশ্চুপ বসে থাকার পরামর্শ দিলাম। কিছুক্ষণ পর জটলা-পাকানো হাউজ টিউটর-সমর্থনকারী দল কটুক্তিমূলক স্লোগান দিতে দিতে প্রাধ্যক্ষ সাহেবের অফিসরুমের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে 'মার' 'ধর' শব্দ উচ্চারণ করে চেয়ার উঁচিয়ে নিলো। তখন কামাল ও আরও বেশ কিছু ছাত্র গিয়ে বিশৃঙ্খল দলকে বাধা দিল। ডাইনিংয়ে হিসাবের ব্যাপারে সমস্ত দোষ যে হাউজ টিউটর সাহেবের, এ কথা আমরা আগেই জেনেছিলাম। পরের দিন সকাল হতে না হতে কামালের নিজের বিভাগের শিক্ষকের প্রতি বিরোধিতার কথা মুখে মুখে বাজতে লাগলো। কথা এক মুখ হতে অন্য মুখে গেলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় ও রং বদলায়– হলোও তাই। হিসাবরক্ষককে প্ররোচিত করে হাউজ টিউটরকে অপমান করার একমাত্র কারসাজি যে কামালের, একথাও অনেকের মুখে শুনলাম। হলের দুজন সুযোগসন্ধানী ছাত্র দু-একদিন পর পর বেশ রাতে হাউজ টিউটর স্যারের বাসায় যাতায়াত আরম্ভ করে দিল। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, বিভিন্ন অকথা-কুকথা বলে কামালের বিরুদ্ধে শিক্ষকের কান ভারী করে তোলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে আমিও বাদ পড়লাম না। শত মিথ্যা অপবাদের মাঝে একটা সত্য প্রতিবাদ যে নিতান্ত তুচ্ছ এবং ক্যাম্পাসের যে-কোনো সাধারণ ঘটনাকেও রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে কারো-না-কারো

গায়ে মেখে দিতে হবে, এ কথা বুঝতে পেরে দুজনে দুদিন পর গ্রামের অনতিদূরে বাজারের সেই নিভৃত রুমটিতে ফিরে এলাম। বিভাগীয় স্যারের ব্যাপার– স্যার যে আমাদের রেজাল্টের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে এ কথা বলায়, কামাল 'পরে দেখা যাবে, সব ঠিক করে নেব' ইত্যাদি কথা বলে স্বভাবমতো নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে লাগলো। আমি কিন্তু সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হতে পারলাম না– তবুও পড়াশোনায় মন দিলাম।

৫.

আজ রোববার। কয়েকদিন আগে ভার্সিটি থেকে ফিরেছি, অথচ বাড়িতে আসা হয়নি। বিকেল চারটার দিকে কামালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এলাম। সন্ধ্যার আগে রুমে ফিরতে হবে। মা না-খাইয়ে ছেড়ে দিতে রাজি নন। সন্ধ্যা হতে আর আধ-ঘণ্টা বাকি। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণ জুড়ে বেশ মেঘ জমেছে। কালো কালো মেঘ। রুমে ফিরতেই হবে এই ভেবে মায়ের বাধা ঠেলে তবুও বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে জোর বেঁধে নিলাম। নিজের গ্রাম পার হয়ে পরের গ্রাম পার হতে চলেছি। এখনো দেড়-মাইল মাঠ পাড়ি দিতে হবে। এরপর আরেকটা গ্রাম, তারপর বাজার। এতক্ষণে মেঘের অবস্থা প্রগাঢ় হতে প্রগাঢ়তর হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সাদা ধুলোর কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। পরিষ্কার বুঝলাম, ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে। মাঠের দ্বারপ্রান্তে যেখানে এখন মাথাভাঙা বুড়ো বটগাছটায় শকুনে বাসা বেঁধেছে, ওর ঠিক উত্তরে– পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে কলিম সর্দারের কুঁড়ে ছিল। কলিম সর্দার নিঃসন্তান, দূর-সম্পর্কীয় এক নাতি, বউ আর সে, এই নিয়ে ছিল তার সংসার। উত্তর-দুয়োরে একখানা ঘর। ঘরের পিছনে চার-পাঁচ হাত জায়গা জুড়ে একটা চাল দেয়া– বর্ষাকালে জ্বালানি রাখা চলে। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক জুড়ে বিশাল মাঠ। এহেন পরিস্থিতিতে এই মাঠ পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না ভেবে কলিম সর্দারকে না বলেই দুজনে ঘরের পিছে ছোট চালাটার নীচে আশ্রয় নিলাম। এতক্ষণে সন্ধ্যার আঁধার কালো মেঘের সাথে মিশে আরও অন্ধকার করে তুলেছে। অন্ধকার ও ধুলো একাকার হয়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। নিজের

হাতখানাও দেখার সাধ্যি নেই। ঝড়ের সাথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। বৃষ্টির ফোটা ঝড়ের পাখায় ভর করে শরীরে কাঁটার মতো বিঁধতে আরম্ভ করলো। ভাবলাম, আজ আর নিস্তার নেই। ঝড় ও বৃষ্টির গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে পেতে চরমে পৌঁছে গেল। নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে পাশে পড়ে থাকা দুটো তালের পাতা কুড়িয়ে একটা নিজে ও অন্যটা কামালকে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পাশাপাশি বসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝড়ের প্রবল দাপটে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তালপাতা জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে অকেজো হয়ে পড়লো। তবু শক্ত করে ধরে আছি, কিন্তু ঝড়ের বেগের কোনো কমতি নেই। আর এই ঝড়ের বেগ ও বৃষ্টিকে বাধা দিতে গিয়ে কালো মেঘমালা একের পর এক বিরামহীনভাবে যেন কামানের গোলা বর্ষণ করে চলেছে। সে গোলার লেলিহান শিখা যেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ এক তাণ্ডবলীলা। নিজের ভাষায় গুছিয়ে এ রূপের যত বর্ণনাই দেয়া যাক না কেন, তা যেন কোনো ক্রমেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে না। শরৎ চাটুয্যের উপন্যাসে পড়েছিলাম, অন্ধকারেরও নাকি একটা রূপ আছে– আজ তা কালো মেঘ ও ঝড়ো বৃষ্টির সাথে মিশলে কেমন হয়, সচক্ষে দেখলাম। আর এ বর্ণনা যে, চাটুয্যে মশাই ছাড়া আমার মতো আনাড়ির পক্ষে সম্ভব নয় তাও ভাবলাম। নিজেকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, যেন এ দেহটা আমার না। হয়তো, ইহজনমের কোনো এক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে পুনর্জন্মে শকুন হয়ে জন্মেছি। তারপর অপরিচিত কোনো এক তালগাছের মাথায় নিতান্ত একটি ডালকে বুকের একমাত্র সম্বল করে সাথীকে নিয়ে যুঝছি। আর সেই পাপ আজ ঝড়বৃষ্টির রূপ ধরে আমার অস্পৃশ্য আত্মাকে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও ব্যথাতুর করে তুলেছে। গলার স্বরকে যথাসম্ভব বাড়িয়েও ক্ষীণ স্বর হলো, ডাকলাম– কামাল?

ও উত্তর দিল– হুঁ।

নিজের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস এলো। বিদ্যুতের এক ঝলক আলোয় নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম– সমস্ত দেহটা ভেজা, কর্দমাক্ত। তারপর থেকে ডান হাত দিয়ে চোখের কাদাকে যতদূর মোছা যায় মুছতে মুছতে দুই-

এক মিনিট পর পর বিদ্যুতের আলোয় কামালের মুখটাকে দেখতে লাগলাম। আর বিদ্যুতের কাছে মনে মনে বার বার আরেকবার চমকানোর অনুরোধ জানিয়ে সেই আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাবলাম, জীবনের এমন একটা দিনেও কামাল আমার সাথী। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ঝড়বৃষ্টি ক্রমশ থেমে গেলেও মেঘের গুরুগম্ভীর রব তখনো চলতে থাকলো। দুজনে লুঙ্গি যথাসম্ভব গুছিয়ে নিয়ে সামনে পদচালনা করলাম। রুমে পৌঁছে কামাল আমাকে বললো– তোমার আমার এ দিনটা স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমরা প্রতিদিন বিকেলে সন্ধ্যার এক-দেড় ঘণ্টা আগে বাইরে বেড়াতে বেরোতাম। কখনো অপরিচিত কোনো গ্রামের রাস্তা ধরে বেশ দূরে চলে যেতাম, কিংবা হয়তো কোনো বড় মাঠের মধ্যে জমির আলের উপর পাশাপাশি বসে গল্পে মেতে উঠতাম।

সেদিন পাকা রাস্তা ধরে পশ্চিমে হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূর চলে গেছি। রাস্তার দুধারে বড় বড় গাছ। যেখানে ফাঁকা ছিল নতুন করে, সম্ভবত বছর দশেক আগে গাছের চারাগুলো লাগানো হয়েছে, এমন একটা গাছের তলায় গিয়ে দুজনে দাঁড়ালাম। গাছটা ফুলে ফুলে ভরা। ফুলগুলো সাদা রঙে লাল মিশ্রিত, থোকা থোকা হয়ে ফুটে আছে। কী সুন্দর ফুলগুলো! তলায় দাঁড়িয়ে ভ্রমরের গুণ গুণ আওয়াজ বেশ মধুর লাগছিল। পাশের খেজুরগাছে পাঁচ-সাত হাত উঠতেই বেশ কিছু ফুল হাতে পেলাম। কিছু কামালকে দিলাম ও কিছু নিজে রাখলাম। রাস্তার উত্তরে দোচালা ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের সামনে এক ফালি উঠোন। উঠোনের পাশে তিন-চারটা কলাগাছ। উঠোনের এক কোণে এক গ্রাম্যবধূ উনুনে ভাত রান্না করছে। কোলের মধ্যে একটা দুধের বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে। ডান পাশে উনুনের ধারে বসে বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক। বুঝলাম, বধূটির স্বামী। বধূটি উনুনে জ্বালানি দিতে দিতে আস্তে আস্তে কী যেন বলছে, আর উভয়ে চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসছে। কামালকে ইশারা করে দেখালাম। দম্পতিটা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। এক সময় স্বামী তার স্ত্রীর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সহসা নাড়া দিল। বধূটি একটু মুচকি হেসে মুখটাকে সরিয়ে নিলো। ভাবলাম, অতটুকু ছোট্ট ঘরে ওরা কত সুখী! আর এ বিশ্বাস আমার এলো যে, নিঃস্ব গরিবের জীর্ণ কুটিরে খুঁজলেও সুখের সন্ধান পাওয়া যায়,

দরকার শুধু সুন্দর মন, আর নির্মল অনুভূতি। ওখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে দুজনে রাস্তা ছেড়ে সোজা দক্ষিণে– মাঠে নেমে পড়লাম। মাঠে অগভীর নলকূপ বসিয়ে ইরি ধানের চাষ করা হয়েছে, ধানগুলো পক্কপ্রায়। দখিনা বাতাস ধানের উপর দিয়ে খেলে চলেছে, আর সে আনন্দে ধানগাছগুলো একে অন্যের গায়ে একবার হেলে পড়ছে, আবার খাড়া হচ্ছে। একটা আল ধরে দুজনে সামনে চলতে লাগলাম। সামনে উঁচু পাড়, হয়তো কোনো পুকুরের পাড় হবে। এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা বড় পুকুর। আকারে একে আর পুকুর বলা চলে না, যেন একটা বড় দিঘি অথবা গভীর বিল। অনেক পুরনো বলে মনে হলো। একটা দিক বেশ দূরে গিয়ে মাঠের সাথে মিশে গেছে। দিঘির পূর্ব পাশে বেশ কচুরীপানার আড্ডা জমেছে, ওগুলোকে দেখলে বেশ বুনিয়াদী বলেই মনে হয়। পশ্চিমের পাশে আগাছামুক্ত কালো জল, হেলে পড়া সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। তার সাথে মৃদুমন্দ দখিনা বাতাস আলগা ঢেউ তুলেছে। ওপারে দেখলাম একটা গ্রাম। গ্রামটা দিঘিটা বাদে কিছুদূর গিয়ে আরম্ভ হয়েছে। প্রথমে বাঁশঝাড়, তার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা ঘর দূর থেকে চোখে পড়লো। আমি ও কামাল পুকুরপাড়ে ঘাসের উপর বসলাম।

বললাম– দেখো না, এই যে কালো জল আর উপরে নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ, ওদের মাঝে কত ব্যবধান, তবুও ওরা কত আপন, কত নিবিড়। না আছে কাছে পাওয়ার কোনো চঞ্চল আকুতি, না আছে বিরহ, তবুও ওরা সত্য; একে অন্যের পরিপূরক। যুগ যুগ ধরে একে অন্যকে ভালোবেসে চলেছে, চায় না কেউ কোনোদিন কোনো প্রতিদান, ওরা কত সুন্দর, কত গভীর ওদের ভালোবাসা। আর ঐ যে কচুরীপানাগুলো– ওরা জলের গভীরে শিকড় গেড়েছে, কালো জলকে আঁকড়ে ধরে আছে, তবুও ওদের সাধ মিটছে না– আরও আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে।

সেদিন আমার কথায় কামালের মনে কোনো ভাবের উদয় হয়েছিল কিনা জানিনে, কিছুক্ষণ পর শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে শুনেছিলাম। তারপর দুজনে উঠে মৌনভাবে হাঁটতে হাঁটতে রুমে ফিরে এসেছিলাম।

রাতে বিছানায় শুয়ে কামাল আমার হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিল– কথা দাও সুজন, যেখানেই থাকি চিরদিন বন্ধুবেশে আমাকে তুমি পাশে রাখবে?

একটু নীরব থেকে কামালের হাতখানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে বলেছিলাম– আবার কথা দিতে হবে? কেন, ঐ যে যেদিন আমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলে, সেই পুকুরপাড়ে বসে কথা দিয়েছিলাম, মনে নেই?

– আছে। ও বললো।

আজ কামালের গলার স্বরে না আছে যেন কোনো গাম্ভীর্য, না আছে কোনো দৃঢ়তা; ও যেন আজ সহজ, সরল, কচি একটা নিষ্পাপ শিশু।

বললাম– আবারো কথা দিচ্ছি যতদিন বাঁচি তোমার পাশে থাকবো, আকাশের মতো দূর থেকে হলেও ভালো জেনে যাব, শুভ কামনা করবো, বিপদে পাশে দাঁড়াবো। তবে তুমিও কথা দাও, আজ থেকে আমি যা বলবো তুমি নীরবে, নির্দ্বিধায় সত্য বলে মানবে এবং বিশ্বাস করবে? রাজনীতির ঐ পঙ্কিল পথ থেকে সরে এসো। মানুষের জীবনে টাকার দরকার আছে মানি, কিন্তু তা কত? দিঘির ঐ স্বার্থপর কচুরীপানার মতো একটা শ্রেণি সমাজের গভীরে রাজনীতির নামে ক্ষমতা ও স্বার্থের শিকড় গাড়ছে। রাজনীতি করতে চাও, আপত্তি নেই। নিজের চরিত্র গড়ো, স্বভাবটা সুন্দর করো, চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা আনো, তারপর জনসেবায় নেমো।

– হ্যাঁ, করবো। ও একটু চুপ থেকে উত্তর দিল।

ওর হাত ধরে কী জানি অনেক কথা বলেছিলাম। তারপর কখন জানি ঘুমিয়ে পড়েছি।

সময়কে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই, আমরাও পারলাম না। দিন সামনে এগোচ্ছে। একদিন দুপুরে পিয়ন এসে একটা চিঠি কামালকে দিয়ে গেল। কামাল প্রথমে পড়লো, তারপর আমাকেও শোনালো। আমাদের দুজনকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে লেখা। রুনী লিখেছে, 'বর্তমান বিশ্বে বেশ কয়েকজন পুরুষকে মেয়ে হতে দেখা গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিনে আমার সুজন ভাইয়াকে নিয়ে। ঘর তো দুজনে ভালোই বেঁধেছ কিন্তু যদি তেমনটি হয় তখন আমার উপায় কি হবে? ---।'

কামাল খুব করে হাসলো। হালকা রসিকতা আর কী! এ বয়সে এটা লেখা সম্ভব। আমিও হাসলাম বটে, তবু পরাজয়ের গ্লানিতে মনটা কেমন যেন

করতে লাগলো। রাতে রুনীকে একটা চিঠি লিখলাম। চিঠিটা বেশ বড় হলো। তার মধ্যে এ কথা কয়টাও লিখলাম–

'শুনেছি প্রেমের মরা নাকি জলে ডোবে না। তা তুমি এত অল্প বয়সে এত অল্প পানিতে হাবুডুবু খেয়ে মরতে এলে কেন? আমি কিন্তু তোমাকে ভাসতে দেব না, ডুবিয়েই ছাড়বো। ভার্সিটিতে ভূ-তত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হয়ে এখন দেখছি নৃ-তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছো। দেখো, শেষে 'নৃ'-র ছোবল খেয়ে 'ভূ'-তে গিয়ে আশ্রয় না-নিতে হয়।'

কামালকে চিঠিটা পড়ালাম, তারপর পোস্ট করে এলাম।

দিন চার-পাঁচ পরে পহেলা বৈশাখ এলো। দেখি, দুটো রঙিন খাম নিয়ে পিয়ন হাজির। খামের ভিতর ভিউ-কার্ড। আমারটাতে লেখা– "অতীতের সমস্ত পরাজয়ের গ্লানিকে ধুয়ে মুছে নববর্ষ বয়ে আনুক আপনার জীবনে সুখ ও শান্তি। আর নব নব প্রেরণায় জীবন উজ্জীবিত হয়ে উঠুক। শুভ কামনায়–"

'ভাবী'

৬.

দেখতে দেখতে দিনগুলো অতীতে পরিণত হতে লাগলো। পরীক্ষার আর দুমাস বাকি। কামাল হলে ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে দিল। ওকে যাবার কথা বলে বললাম– আমিও বাড়ির কাজ গুছিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে আসছি। জুন মাস, আগামীকাল এগারো তারিখ। সকালেই কামাল বিদায় নেবে। আজ বিকেলে দুজনে কোথাও বেরোলাম না। মনটা বার বার হারানো ব্যথার কথা মনে করে গুমরে কেঁদে উঠতে লাগলো। কামাল বিছানায় শুয়ে আছে, আমি জানালার ধারে চেয়ারে বসে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। দুজনেই ম্রিয়মাণ, গভীর শোকে আচ্ছন্ন। কামাল হয়তো ভাবছে– 'সুজনকে ছেড়ে চলে যেতে হবে'। তিনটা মাস ধরে এই নিভৃত ছোট্ট ঘরটাকে, চারপাশের লোকজনকে, রাস্তাঘাটকে কত আপন করে নিয়েছি, সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে। এই তো চলা– এই তো জীবন! এ পথটুকুর এখানেই সমাপ্তি। আবার কোনো পথের ধারের নতুন জায়গায় ছাউনি ফেলতে হবে। এমনই

করে একদিন পথ ফুরিয়ে যাবে, পথের ধুলোয় এ জীবনের অবলুপ্তি হবে। হয়তো কবির সেই কথাটাই কামালের মনে বার বার উঁকি দিচ্ছে–

"জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে,
এক হাটে লও, বোঝা শূন্য করি
দাও অন্য হাটে।"

আমি নির্বাক, বসে আছি তো আছিই– খোলা জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে। ভাবছি, এই ছোট্ট একটা ঘরে এত নিবিড়ভাবে কামাল ও আমি কোনোদিনই আর থাকবো না। আমার এভাবে আর একাও এ রুমে ফিরে আসা হবে না। পরীক্ষা আসছে, সবাই তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। তারপর কর্মজীবন। কে কোথায় কীভাবে কাটাবে জানা কঠিন। হয়তো ঠিকানা একটা থাকবে কিন্তু এত কাছে, এত স্মৃতিভরা দিন আর ফিরে আসবে না। ছাত্রজীবন মানে মুক্ত জীবন, অন্য কোনো চিন্তা মাথায় আসে না। পড়া ও সময় করে গল্প করা। রাতের পর রাত বন্ধুর সাথে গল্প করলেও গল্প শেষ হয় না। এভাবে আর হয়তো গল্প করা যাবে না। তারপর? হয়তো, কোনো বাসে কিংবা ট্রেনের বগীতে ঝুলন্ত অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে দশ মিনিটের জন্য দেখা হবে। হয়তো, শুধু ভালোমন্দটা জিজ্ঞাসা, তারপর কর্মের ব্যস্ততায় যার যার মতো নেমে পড়া। এমনই করতে করতে জীবনের শেষ বেলায় কিংবা আকস্মিকভাবে কোনো দুর্ঘটনায়, কামাল হয়তো শুনতে পাবে 'সুজন আর এ পৃথিবীতে নেই, পরলোকে পাড়ি জমিয়েছে।' কথাটা শুনে হয়তো কামাল রুমালে চোখ মুছবে– স্মৃতির জানালা খুলে যাবে, মনে পড়বে এই ঘরটার কথা। খোলা জানালায় পাশাপাশি শুয়ে দুই বন্ধুর ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকার কথা। তারপর, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। ধীরে ধীরে কর্মময় জনসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে তলিয়ে যাবে সব। স্মৃতি হবে বিস্তৃতি।

ভেন্টিলেটরে বাসা-বাঁধা পাখিগুলো ডিম পাড়বে, বাচ্চা ফুটোবে, উড়ে যাবে। সময় হবে, আবার আসবে। বাসা বাঁধবে। আমাদেরকে পাবে না, আমরা থাকবো না। এই মাঠ যুগযুগান্ত ধরে এখানেই পড়ে থাকবে। এই সবুজ ধানক্ষেত প্রতি বছর এই সময় বয়ে আনবে সবুজের সমাবেশ, পাতায়

পাতায় বাতাস খেলে যাবে। দুজনে আর ঐ সবুজের মাঝে বসে রুনীর গল্প করবো না। যদি অন্য কোনো অভিনেতা এই মঞ্চে আসে, গল্প শোনায়– সে গল্পে থাকবে না সুজন-কামাল, থাকবে না রুনী। স্থান পাবে নতুন কোনো অভিনেত্রী– এই তো খেলাঘর, এই তো মোসাফিরখানা!

'শুধু ধাও, আরো বেগে ধাও,
চেওনাকো ফিরে পিছু,
যা পাও, শোধ করে নাও,
রেখনাকো ধরে কিছু।'

জানি না কখন চোখের কোনায় এক ফোঁটা অশ্রু আমার অজান্তেই আমাকে ফাঁকি দিয়ে গড়িয়ে গণ্ডের উপর থেমে আছে। আমি তন্ময়, আমি ভাবুক হয়ে গেছি।

কামাল বললো– মন খারাপ করো না সুজন, এই তো কদিন বাদে আবার ক্যাম্পাসে দেখা হবে।

কথাটা শুনে আমার মনটা আরো অজানা ব্যথায় প্লাবিত হয়ে গেল। আসলে আমরা প্রত্যেকেই মানুষ, কিন্তু প্রত্যেকের অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া, ভাবনা, অভিব্যক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, জীবন জিজ্ঞাসা এক নয়। কোনো একটা দৃশ্য দেখে কেউ হাসে, আবার কেউ কাঁদে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে অনেকেই যায় না, ঘটনার বাহ্যিক দিক নিয়েই নাড়াচাড়া করে। কী উদ্দেশ্যে এলাম, কী পেলাম, কোথায় জীবনের সার্থকতা, কেন এত আয়োজন– এ জিজ্ঞাসা জবাবহীন রয়ে যায়। বড় বৈচিত্রময় এ বিশ্বসংসার!

ছোটবেলায় কারণে-অকারণে অনেক কেঁদেছি। আবার তক্ষুনি একটা নারকেলের নাড়ু পেয়ে প্রাণ খুলে হেসেছি। সে কান্না কখনো হৃদয়কে অতটা স্পর্শ করেনি, তাই আবার সাথে সাথেই হেসেছি। কিন্তু জীবনের একতারায় যখন তার বাঁধতে শিখলাম, বয়স বাড়তে থাকলো, নতুন সুর এলো জীবনে, অনুভূতি এলো মনে, তারপর থেকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সয়েছি, কয়েকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি, হৃদয় কেঁদেছে– আমাকে কাঁদাতে পারেনি, চোখে জল আসেনি। কিন্তু আজ কামালের বিদায়ের ব্যথায় আমার

চোখে জল এসেছে, আমি কাঁদলাম। ছোটবেলার মতো নাড়ু পেয়ে আর হাসতে পারিনি। তাই আজ পড়ার টেবিলেও বসা হয়নি। সারা রাত কামালকে পাশে নিয়ে শুয়ে আছি আর ভাবছি, শুধু ভাবছি এ ভাবনার শেষ কোথায়!

সকাল সাড়ে-দশটার দিকে বইপত্র গুছিয়ে কামালকে সঙ্গে নিয়ে বাসস্টপেজের দিকে চলেছি, ওকে বিদায় দিতে। সামনের কৃষ্ণচূড়ার ডালে প্রতিদিনের মতো ফুল ফুটে আছে, সে ফুলের মাঝে আজ আর হাসি দেখতে পাচ্ছিনে। ফুলের হাসি থেমে গেছে– তারা আজ ম্রিয়মাণ। দৃষ্টিটা গাছের ডালে না গিয়ে বার বার ঝরে-পড়া ফুলগুলোর দিকে যাচ্ছে। মনটা গুমরে কেঁদে ফিরছে কিন্তু কাঁদছিনে। স্টপেজে দশ মিনিট অপেক্ষার পর বাস এসে গেল। ও বাসে উঠলো, ওকে নিয়ে বাস চলতে আরম্ভ করলো। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। বাসটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, একসময় ওটা দৃষ্টিসীমার অন্তরালে চলে গেল। রুমে ফিরে আসছি। দুধারের দোকানপাট কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে, চোখে দেখছি সেই চলন্ত বাসটা, সেই সিটটা– যেখানে কামাল বসে আছে।

রুমে এলাম। মনে হচ্ছে রুমটা যেন হারানো ব্যথায় কাঁদছে। সবকিছুই শূন্য মনে হতে লাগলো। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি বইগুলোর অর্ধেক খালি। হ্যাঙারগুলোর বেশ কয়েকটা শূন্য পড়ে আছে। বাজারের একটা দোকানে ক্যাসেট বাজছে, সেই চেনা সুর– "তুমি নি আমার বন্ধু রে, আমি নি তোমার বন্ধু, তুমি নি আমার বন্ধু রে ---।" গানটা অনেক দিন শুনেছি কিন্তু আজ যেন ওর আবেদন পাল্টে গেছে। আজ যেন ওটা আর গান নয়, বিরহের সুর। হৃদয়ে শেল সম বিঁধছে। বাজারে ফিরে গেলাম। কয়েকটা দোকানকে আশ্রয় করে সারাটা দিন কাটিয়ে দিলাম। রাতে বিছানায় ঘুম আসছে না– এদিক-ওদিক করছি। এমন করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনে। সকালে উঠলাম, দেখি আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হচ্ছে। হাত-মুখ ধুয়ে টেবিলে পড়ে থাকা খাতা-কলম নিয়ে খাটের উপর জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। একটা বালিশ বুকের নীচে নিয়ে কলম ধরেছি–

উঠে সকাল বেলা–
সমগ্র আকাশে চলছে বর্ষার খেলা।

যেদিকে যায় যতদূর দৃষ্টি
দেখছি শুধু অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি।
আরও আসছে কানে বৃষ্টির একটানা নিপতন গান
মাঝে মাঝে শোনা যায় মেঘের নিবিড় কলতান।
কখনো মনে হয় সে আওয়াজ নদীর কলধ্বনি
কখনো শোনা যায় তালের পাতার মর্মর বাণী।
তারপর দেখি মাঠ পানে চেয়ে বইছে প্রাণের হিল্লোল
ঘরের পিছে নারকেল গাছগুলো দিচ্ছে সদা দোল।
থেকে থেকে পাতাগুলো সব বেঁকেচুরে করছে কোলাকুলি
ক্ষনিক পরে বাতাস এসে দিচ্ছে তা মেলি।
আজকের দিনে কত অজানা সুর উঠছে মনে ভেসে
গুনগুন সুরে হৃদয় হতে মিলছে মুখে এসে।
কখনো কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি গান
কখনো-বা আধখানা হয়ে,
কত পুরনো কথা, কত লুকানো ব্যথা
কত অব্যক্ত ভাষা মনে উঠছে ছেয়ে।
আরও কতদিনের লুকোচুরি খেলা
মনে পড়ছে এইক্ষণে,
কত বর্ষার পানিতে ভাসানো ভেলা
‘বলা যায় তারে কি এমন দিনে’।

৭.

দিন চলে যাচ্ছে। বেশ কদিন হলো বাড়িতে এসেছি। সংসারে এসে সংসারী হয়েছি। ভার্সিটিতে যাব, তারই প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু সংসার সমরাঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করা কি এতই সহজ! তবুও আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কামালকে মাঝে মধ্যে চিঠি লিখি। উত্তর আসে, কিন্তু সে কদাচিৎ।

প্রতিনিয়ত কত ফুলই না আমরা দেখছি, দেখলেই নাকে ধরতে ইচ্ছে করে। এই দেখা যদি মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখি তাহলে হয়তো দেখতে পাব 'নাকে ধরার মতো একটা ফুলও নেই'– তাতে লেগে আছে অসংখ্য কীট। তাই কামালকে ভয় হয়। কী জানি, পিছে আঘাত দিয়ে পালায়!

অনেক কষ্টে সংসারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে নিয়ে একদিন ভার্সিটিতে পাড়ি দিলাম। অন্য কিছু হোক আর না হোক, কামাল ও রুনীর দেখা মিললো। তাছাড়া পরীক্ষাও তো দুয়োরে উঁকি দিচ্ছে। মাত্র এক মাস বাকি। কামাল কিন্তু হলে এসে রাজনীতিতে আবার পুরোদমে বহাল হয়ে গেছে। বেশ কিছু অপকর্মের কথাও অনেকের মুখে শুনলাম। আগের মতো রুমটাও রাজনৈতিক কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

পাঁচ-সাত দিন কেটে গেল। হলের এক বড় ভাই বেশ কয়েক মাসের জন্য বাড়িতে যাচ্ছে। তাকে বলে-কয়ে তার সিঙ্গেল সিটের রুমটাতে থাকার ব্যবস্থা করলাম। আমি রুমে গিয়ে উঠলাম। এ যে অনার্স পরীক্ষা, জীবন পরীক্ষা! পড়তে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে! কিন্তু কামালের পরিণতি বুঝতে পেরে তার প্রতি আমার সব আশা-ভরসা ব্যর্থ হতে চলেছে ভেবে, একদিন তাকে ডেকে একাকী অধিকারের সুরে অনেক বকাঝকা করলাম। শেষে এও বললাম যে, তোমার রুমে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা, তাতে পড়াশোনা হওয়া দূরের কথা, একদণ্ড চোখ বুজে শোয়ারও জো নেই। সময় করে কাউকে না জানিয়ে এ রুমে এসে পড়াশোনা করো।

কিছু লোক আছে যারা কাউকে উপকার করতে পারুক আর না পারুক, দু-পাঁচটা মিষ্টি কথা বলে একটু সাহায্যের বাণী শুনিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। আবার অনেকে আছে যাদের ইচ্ছে আছে, উপায় নেই; তবু ফেরাতে পারে না, তাই কথা দিয়ে বসে।

একজন একজন করে কামালের রুমে আর অতিথি ধরে না। এ কে? 'চাচি আম্মার বেয়ানপুত।' ও কে? 'আমার পার্টির ছেলে।' নাদুস-নুদুস চেহারার ছেলেটা কে? 'সেদিন ট্রেনে আসতে পরিচয় হয়েছে– বাড়ি নাভারন, প্রিভিয়াসে ভর্তি হবে।' এস এস হলের ছেলেটি এখানে কেন? 'ওর রুমে খুব গেনজাম তাই নিয়ে এসেছি।' এমনই করেই রুমটা ভর্তি। না আছে

বিছানাপত্রের কোনো ঠিক, না আছে শোবার ঠিক। যে যখন যেখানে সুযোগ পায়, সেখানেই কাত। এভাবে 'হাতিঘোড়া হলো তল, ভেড়া বলে কত জল' হয়ে, সুপরিচিত অনেকজনকে সহযোগিতার আশ্বাস দিতে গিয়ে শেষে সিট ছাড়তে হলো। সম্বল হলো আমার থাকা সেই সিঙ্গেল বেডের রুমটি। দুজনে আছি। শুধু থাকা তো আর নয় কার্যালয়টি স্থান পরিবর্তন করেছে। যেখানে খাজা বাবা, সেখানেই সাগরেদগণ। প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত, একে একে 'তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা' চলতে লাগলো। বন্ধুমহলের অনেকেই আসেন আমার কাছে, উপদেশ দেন। কেউ বলেন– 'ভেবেছিলাম আপনাকে দিয়ে একটা ভালো রেজাল্ট হবে কিন্তু এ কী? এ যে হরিনাথের মেলা। চলুন আমার রুমে, দুজনেই থাকা চলবে।'

ভাবি– গেলে তো তোমার ভালোই হয় কিন্তু আমার অবস্থা?

আবার কেউ কেউ বলেন, 'কেন বাপু নিজের হল ছেড়ে এ হলে এলে, শেষে জীবনটা নষ্ট করলে।'

আমি কোনো কথার উত্তর দিইনে– শুনেই চলি, কামালকেও জানাইনে। আবার মাঝে মধ্যে চিন্তা করতাম– আচ্ছা, সামনে পরীক্ষা, কামাল কি আমার সম্বন্ধে একটুও ভাবে না! ওর মনে কি একটুও ইচ্ছা হয় না, আমি ভালো রেজাল্ট করি? আর তাই যদি হবে, তবে আমার পড়ার সুযোগ দেয় না কেন?

বন্ধুমহলের এমনই একটা ছেলে বরুণ। পাশের রুমে থাকে। সময় নেই, অসময় নেই আমার রুমে আসে। আমিও তার রুমে যাই। অনেক গল্পই আমার সাথে করে, আমি শুনি। কখনো-বা আমি কিছু বলি। সেদিন কামালের সেই 'অতিথিভবনে' অর্থাৎ আগের সেই রুমে নাস্তা করতে এসেছি– প্রতিদিনই আসি। নাস্তা অন্য কিছু নয়– চালে-ডালে খিচুড়ি। সারারাত জাগার পর সকালে ক্যান্টিনে সয়াবিনের তেলে ভাজা পরটার বিকল্প হিসেবে হিটারে একটা বয়ের সাহায্যে আমাদের এ আয়োজন। এ পর্যন্ত চার বছরে শুধু ভূতের বেগার খাটছি মাত্র। বলা চলে, কোনো সার্টিফিকেট পাইনি। আবার পাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। হ্যাঁ, একটা পেয়েছি, আর একটা অনার্স পরীক্ষা শেষে পেতে চলেছি। যেটা পেয়েছি তা

হলো, গত তিন বছর শেষে ভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের ডাক্তার সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত 'গ্যাসট্রিকের রোগী' নামে সার্টিফিকেট। এই গ্যাসট্রিক-আলসারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নয়, পরীক্ষার এ-কটা দিন যাতে গ্যাস না বাড়ে, বমি না হয়, পেটের ব্যথার কিছুটা উপশম হয়– সেজন্য এই খিচুড়ির আয়োজন। আজও তাই খেতে এসেছি 'অতিথিভবনে'। আমি একটু আগে এসেছি, কামাল পরে এলো। চেয়ারে বসতে বসতে আমাকে বললো– আচ্ছা সুজন, তুমি বরুণকে কী বলেছো?

– কই কিছুই তো না। কেন, কী হয়েছে?

ও বললো– তুমি নাকি বলেছো, আমার জন্য তোমার জীবনটাই শেষ করলে, পড়াশোনা একেবারেই করতে দিচ্ছিনে, আমার বিবেক বলতে কিছু নেই, ইত্যাদি অনেক কথা।

বললাম– কই না তো? এ ধরনের কথা তো আমি বলিনি? এমন কথা আমি তাকে বলতে পারি, এ তোমার বিশ্বাস হয়?

ও বললো– তুমি না বললে ও কি মিথ্যা বলছে?

বললাম– আমাকে বিশ্বাস করো, আমি এ ধরনের কিছু ওকে বলিনি।

– বরুণ আমাকে ঠিকই বলেছে। ও আবার বললো। ওর কণ্ঠে এবার দৃঢ়তার সুর।

কামাল নাস্তা করে সজোরে বেরিয়ে গেল। আমি কথাগুলো মন থেকে মেনে নিতে পারছিনে। বার বার মনে হচ্ছে কামাল আমাকে ভুল বুঝছে! ও আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না! আমার বেশ খারাপ লাগতে লাগলো। মনে হলো, সবি ভুল, সবি মিথ্যে! এই তো সেদিন ও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল, আমি যা বলি ও সত্য বলে জানবে। তবে কি সেগুলো মৌখিক আচরণ (?)! আচ্ছা, ও কি একবারও ভাবলো না যে, বরুণ তো নিজ থেকেও ওকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এভাবে বলতে পারে! বরুণ এত বড় মিথ্যা কথা ওকে কীভাবে বলতে পারলো? সে কি একটুও ভাবলো না যে, কথাটার এক্ষুনি প্রমাণ হবে! আস্তে আস্তে রুমের দিকে হাঁটলাম। দেখি, কামাল চেয়ারে বসে আছে। নিজের রুমে না ঢুকে সোজা বরুণের রুমে গেলাম।

বললাম– বরুণদা, এদিকে একটু আসুন তো।

বরুণদা পিছু পিছু এলো। আমি সোজা খাটের উপর গিয়ে বসলাম। বরুণদাকে জিজ্ঞেস করলাম– আচ্ছা বরুণদা, আমি কামাল সম্বন্ধে একটা কথাও কি আপনাকে বলেছি? কেন আপনি ওকে এসব কথা বলতে গেলেন?

আমার কণ্ঠ তখন জোরে বেজে উঠেছে। না আছে কোনো মায়া, না আছে কোনো নমনীয়তা, না আছে ভদ্রতা।

বরুণদা অকস্মাৎ কথায় হতচকিত হলেন; একটু হাসলেন, তারপর বললেন– এমনিতে চালাকি করেছিলাম, আপনার পড়াশোনা একেবারে শেষ হতে চলেছে তো তাই।

কথাটা বলতে বলতে বরুণদা সোজা নিজের রুমে চলে গেলেন। কামাল যেখানে যে অবস্থায় ছিল, ভাবগম্ভীর অবস্থায় সেভাবেই বসে রইলো। আমি বসা অবস্থা থেকে বালিশে মাথা রাখলাম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম– পৃথিবী কত বিচিত্র, বিচিত্র তার মানুষ; কেউ কাউকেই পুরো বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু কেন পারে না? তাই এত সংঘাত, এত দ্বন্দ্ব, এত ভুল বোঝাবুঝি। আর বরুণদা, তাকেও তো আমি ভালো জানি। তিনিই-বা এসব মনগড়া কথা বলতে গেলেন কেন? কামালই-বা কেন শুধু তার কথাই বিশ্বাস করতে গেল? এটা কি কামালের মনের দুর্বলতা? মন থেকে তো সে জানে, আমি তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাকে আমার মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করি। সে যে বিত্ত-বৈভব কামনায় ক্ষমতালিপ্সু হয়ে নীতিহীন একটা পথের দিকে ধেয়ে চলেছে, তা কি সে বুঝতে পারছে? আমি তো তার কাছ থেকে বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ কখনো কিছু চাইনি, এ নিয়ে ভাবিওনি। সে ভালো থাক, ভালো পথে থাক, এই আমার প্রত্যাশা। তাকে ভালো লাগে, ভালোবাসি এবং কামাল বলতে মনের গভীরে কোথায় যেন একটা দুর্বলতা অনুভব করি– এর বাইরে আর তো কিছু নয়। আমি চেয়েছিলাম সে আমার এ ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবে, আমাকে বিশ্বাস করবে, প্রকৃত বন্ধু ভেবে পাশে রাখবে। ভালো রেজাল্ট করে ভার্সিটি থেকে দুজনে বেরিয়ে যাব। বন্ধুত্বটা আজীবন অটুট থাকবে। এই তো আমার চাওয়া।

ভেবেছিলাম কামাল হয়তো চেয়ার ছেড়ে বেড়ে আসবে, আমাকে বলবে– সুজন স্যরি, কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

কিন্তু না। একটু পরে কামাল রুম থেকে সোজা বের হয়ে গেল। কোথায় গেল কোনো কথাই বললো না।

পানির গভীরতা যেখানে যত বেশি, চাপও সেখানে তত বেশি। যেখানে যত আঘাত সেখানে তত ব্যথা। আমার অভিমান বা ক্ষোভ যাই হোক– আরো বেড়ে গেল।

পরীক্ষার আর পাঁচ দিন বাকি। দুজনে একই রুমে আছি। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া তেমন কোনো কথা হচ্ছে না, যার যার মতো খাচ্ছি, পড়ছি, বেড়াচ্ছি। আজ দুদিন থেকে কামাল কিরণের কাছে অঙ্ক কষতে যাচ্ছে, ভালোই বুঝতে পারছি।

বাবুল ভাই আমার রুমে এলেন একটা নোট নিতে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– কামাল কোথায় গেছে?

বললাম– জানিনে।

দুজনে কথা বলছি, এমন সময় কামাল রুমে এলো। বাবুল ভাই জিজ্ঞেস করলেন– কোথায় গিয়েছিলেন?

– কিরণ অঙ্ক কষতে যেতে বলেছিল, তাই গিয়েছিলাম।

বাবুল ভাই আমাদের ব্যাপারটা কিছুটা জানতেন, তাই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। আমি জানি কামাল নিজেই গেছে। কিরণ আমার কাছে অঙ্ক শিখতে আসে, সে কীভাবে কামালকে অঙ্ক শেখাবে!

পরীক্ষার আর দুদিন বাকি। মন খারাপ থাকলে পড়াশোনা কেন, কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারিনে, এটা আমার স্বভাব। বই হাতে নিচ্ছি, পড়া না হয়ে ভেসে আসছে কামালের কথা কয়টা এবং তার মুখচ্ছবি। একবার নিতান্ত ইচ্ছে হলো নিজে ডেকে কয়েকটা অঙ্ক কামালকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই। আবার ভাবছি– সেই তো আমাকে এড়িয়ে চলছে, আমার কী এত আসে যায়? প্রয়োজনটা তো তারই। উঠে বাবুল ভাইয়ের রুমে

গেলাম। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা হলো। কামাল প্রসঙ্গ আসতেই বাবুল ভাই বললেন– জানেন, কামাল কী বলছিল? সে নাকি অনেক আশা করে তার সিট আপনার পিছনে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। পরীক্ষার হলে যদি কিছু জিজ্ঞেস করে কিংবা খাতা দেখে লিখতে চায়, তাই আপনি তাকে এড়িয়ে চলছেন।

বললাম– তা বলুক, আমি ভাবছি এক, আর সে ভাবছে আরেক। যার জন্য ভাববেন হিত, সে বুঝবে তার বিপরীত।

রুমে চলে এলাম। বাবুল ভাইয়ের কাছে কামালের বলা কথা কয়টা যেন কিছুতেই ভুল হচ্ছে না। নিজেকে অনেক সংযত করে ভাবলাম– আজ বাদে কাল পরীক্ষা, আর এসব কী শুরু করেছি আমরা! দেখি একটা নোট মুখস্ত লিখি। কাগজ-কলম হাতে নিলাম, লিখলাম। সেটা নোট নয়, লিখলাম–

যারে তুমি করেছো আপন সে তোমারে করেছে পর,
কেমন করে ধরার মাঝে বাঁধবে তুমি আপন ঘর।
যে নদীতে সকাল বিকেল ধসে পড়ে তীর,
সেই সে তীরে কিসের আশে গড়বে আপন নীড়।
নদীর যখন দুকূল হতে ছড়িয়ে যাবে বান
ডুববে তরী নদীর বুকে হারিয়ে সকল প্রাণ।
কাজ কি আমার নদীর তীরে বেঁধে আপন বাসা
এ নিখিলে মানব জনম ক্ষণিক কাঁদা-হাসা।
যদি এ সুর যায় বিকিয়ে পথের দুধারেতে
যদি এ মন যায় রেখে যায় শ্যামল আসন পেতে।
হয়তো কোন অজানা পথে ফিরবো তখন একা,
হয়তো আমার এ পথে আর হবে নাকো দেখা।
যাবার পথে ভালোবাসা বিলিয়ে সবার সনে,
হাসিমুখে চলবো পথে দুঃখ নারে মনে।
যেমনি করে সন্ধ্যাতারা জ্বালিয়ে নিজের আলো,
ভরিয়ে তোলে আকাশটারে দূর করে দেয় কালো।

সন্ধ্যার পর দুজনেই রুমে আছি। কামাল বই সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে। বাবুল ভাই রুমে ঢুকে আমার পাশে বসলেন, বিভিন্ন কথা বলতে বলতে এক সময় আমাদের মনের অবস্থা ভালো না বলে মনে হচ্ছে জানালেন। এক পর্যায়ে পরীক্ষার এ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলার অনুরোধ করলেন। কামাল বলে উঠলো– কই কিছুই তো হয়নি। তা তেমন কিছু না। এ কথা বলে হাসতে লাগলো। আমি অতটা স্বাভাবিক হতে পারলাম না। দেখলাম কোনো অস্বাভাবিক পরিবেশেও কামাল নিজেকে সামলে নিতে পারে। ক্ষণিকের স্বার্থের প্রয়োজনে একান্ত আপনজনকে ভুলে যেতে পারে, আঘাত দিতে পারে। নিজ স্বার্থটাকেই বেছে নেয় এই ভেবে যে, পরে সব ঠিক করে নেয়া যাবে; অন্যের মনে আঘাত তার মনে কোনো দাগ কাটে না। কে কী ভাবলো, মনে করলো, অত ভাবার তার ফুরসত কোথায়– এমন একটা ভাব। দেখে মনে হয়, স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি।

দুজনে উঠে খাবার উদ্দেশ্যে ডাইনিং রুমে চলে গেলাম।

আজ পরীক্ষা শুরু। দুজনে একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসলাম, উদ্দেশ্য পরীক্ষার হলে যাওয়া। চোখে মুখে ভীতির ছাপ– কী পড়েছে, কী লিখবো, প্রস্তুতিও খুব ভালো নয়। কামালের সিট আমার পিছনের ডেস্কে পড়েছে। যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। খাতার উপরে কলম যেন ঠিকমতো লিখতে চাচ্ছে না, থরথর করে কাঁপছে। প্রায় এক ঘণ্টা এমন হতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে নিজেকে কিছুটা সহজ বোধ করতে লাগলাম। কামাল পিছনের সিটে, বার বার আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, কখনো খাতা খুলে রাখতে বলছে। একসময় শিক্ষক এসে আমার খাতা নিয়ে নিলেন, নিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে রাখলেন। আমি অসহায়ের মতো বসে রইলাম। পরীক্ষার সময়-শেষের ঘণ্টা পড়লো। উঠে হলে চলে এলাম। বাকি পরীক্ষাগুলোও দিনে দিনে দিলাম। ঘটনাটা বার বার ঘটতে লাগলো। শেষের পরীক্ষাগুলোতে এসে মনটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। দায়সারাভাবে পরীক্ষা শেষ করলাম, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা রয়ে গেল। আরো এক মাস পরে সেটা হবে। তবেই নিষ্কৃতি।

৮.

দীর্ঘ এক মাস অবসর। পড়াশোনায় শৈথিল্য এসেছে। কামাল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বাকিটা সময় মগ্ন রুনীর সাথে সঙ্গ দেয়ায়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রাজনীতি, বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রুনীর জন্য বরাদ্দ, সন্ধ্যার পর থেকে রাত বারোটা কিংবা একটা– আবার রাজনীতির ধুয়োজারী। এভাবেই রাত আসে দিন যায়। সন্ধ্যায় ফিরে মাঝে মধ্যেই বলে, আজ রুনীর সাথে রাগারাগি হয়েছে, এ হয়েছে– তা হয়েছে ইত্যাদি। রুনী যেন ওকে, ওর কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা আর কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। বিভিন্ন ছোটখাটো কথায় মান-অভিমান বেড়েই চলেছে। জিতের পালা কামালেরই বেশি। একদিন রাগারাগি করে এলেই পরের দিন রুনী এসে হলে হাজির। আবার সব ঠিক। রুনীর দুর্বলতা কামাল বুঝে ফেলেছে। গত পরশু কামালের রুনীর ওখানে যাবার কথা ছিল– কী কারণে যেন যেতে পারেনি। গতকাল দেখা করতে গেলে রুনী একটু অভিমান দেখিয়েছে। কামাল তার উপর খুব রাগ দেখিয়ে হলে ফিরে এসেছে। রুনীর অভিমান ভাঙাতে চায়নি– চেষ্টাও করেনি। রুনী হয়তো চেয়েছিল কামাল আসবে, পাশে বসবে, হাতে হাত রেখে বলবে, কী রুনী, গতকাল আসতে পারিনি বলে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, কিছু মনে করো না লক্ষ্মীটি! কিংবা এমনই অন্য কোনো কথা। তার পরিবর্তে রুনী পেয়েছে উল্টো রাগ।

রাতে রুনী বিছানায় শুয়ে হয়তো অনেক ভেবেছে, নিজে হার মেনেছে– তাই সকাল ন'টা না বাজতেই আমাদের রুমে এসে হাজির। আমি শুয়ে আছি। তিন-চার দিন ধরে গ্যাসট্রিকের ধকল সওয়ার পর কিছুটা সুস্থবোধ করছি– তবু কোথাও বের হচ্ছিনে, শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছি, আর বিকেলে একটু কমনরুমে গিয়ে সময় পার করছি।

রুমে ঢুকে রুনী জিজ্ঞেস করলো– ভাইয়া কেমন আছেন?

বললাম– কিছুটা সুস্থবোধ করছি।

উঠে বসলাম। কামাল চেয়ারে বসে ছিল, পাশ ফিরে রুনীকে দেখে একটু মুচকি হাসলো। কামালের রাগ ক্ষণস্থায়ী, যতই রেগে যাক, একটু পরেই

বিকট হাসিতে ফেটে পড়বে। এখনও হয়তো ভাবছে, রুনীর সাথে গতকালের মান-অভিমানে সে জিতে গেছে, তাই এই হাসি।

তিনজনে বসে গল্প করছি বেশ অনেক্ষণ ধরে। এমন সময় দরজা ঠেলে রুমে বকুল ঢুকলো। বকুল আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। পাশের হলে থাকে। এসেছে আমার সাথে গল্প করার জন্য। একটা পরীক্ষা, তাও অনেক দেরী– সময় কাটে না, তাই গল্প করতে আসে। কামাল চট করে বুদ্ধি করলো। তাস খেলে সময় কাটানো যাক। বাকিদের আপত্তি নেই। খেলা শুরু হয়ে গেল। বকুল আর কামাল একদিকে, আমি আর রুনী বিপরীতে।

খেলা চলছে। প্রথম দিকে উভয় পক্ষই সমানে সমান। আমাদের পয়েন্ট ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠছে। আমাদের খেলার তুলনায় গল্পের দিকেই বেশি ঝোঁক। বকুল গল্পে ওস্তাদ– স্বভাবমতো গল্প করছে, হাসছে। কামাল ক্রমশ গুরুগম্ভীর হয়ে গেল। ভালো কার্ড না এলে ছুঁড়ে মারছে, অথবা মিশিয়ে দিচ্ছে, এমনই করে চলছে। আমি অত ভাবিনি– রুনী কিন্তু বিষয়টা লক্ষ্য করছে বলে মনে হচ্ছে, তবুও হাসছে।

দুপুর একটা বেজে এলো– খেতে হবে। ডাইনিং থেকে বয় ডেকে চারজনের খাবার আনিয়ে খাওয়াপর্ব সমাধা করা গেল। আবার খেলা চলছে। এবার কিন্তু আমরা হেরে যাচ্ছি ক্রমশ, তবু হাসছি, গল্প করছি– হাসছি। কামালও হাসছে– মাঝে মধ্যে আমাদের হারা নিয়ে কটুক্তি করছে। রুনী যেন একটু গুরুগম্ভীর হয়ে গেল– তবুও খেলা চলছে। আমি রুনীর গম্ভীরতা বার বার নিরীক্ষণ করছি। রুনী যেন অন্য জগতে চলে গেছে– হয়তো কিছু একটা ভাবছে।

আমারও বুঝতে বাকি রইলো না যে, রুনী হয়তো ভাবছে কামালের আচার-আচরণ– এমন লোকের সাথে কেমন করে ঘর বাঁধবো! রুনীর ভাবনা আমাকেও ভাবিয়ে তুললো। মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল। ভাবছি স্বার্থপরতার কথা, কামালের কথা। কামাল কেন এমন হলো! এর চেয়ে ভালো হতে সে কি পারতো না? বকুল আমাদের উভয়েরই নিরুৎসাহ দেখে খেলা বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব দিল। খেলা ভেঙে গেল। সবাই চুপচাপ বসে আছি। মাঝে মধ্যে কামাল দু-একটা কথা বলছে, বকুলও বলছে। আমরা

উত্তর দিচ্ছি– দিচ্ছিনে। এমন সময় রুনী আমাকে অনুরোধের সুরে বললো– সুজন ভাই, একটা গান শোনান না। গানটা কিন্তু দুঃখের হতে হবে।

এর আগেও অনেকবার রুনী ও কামাল আমার গান শুনেছে। ওরা অনুরোধ করেছে, আমিও শুনিয়েছি। ওরা তন্ময় হয়ে শুনেছে, আজও শুনতে চাইল। আমার যখন মনটা ভালো না লাগে, গুনগুন করে কোনো গানের কলি মন থেকে মুখে চলে আসে, শেষে গান হয়ে যায়। আজ আনত স্বরে গান আরম্ভ করলাম– '--- এ হৃদয় ধূপসম তোমারই জ্বালায়, যাক যদি পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাক, ---'।

রুনীর অনুরোধে পর পর দুটো গান গেলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই, নির্বাক হয়ে সবাই বসে আছি। কামাল কী জানি কথা আরম্ভ করলো বকুলের সাথে। আমাদের দুজনের ভাবের আবেশ তখনও কাটেনি– তাই ভাষাহারা, মূক হয়ে বসে আছি।

সন্ধ্যা লেগে আসছে। রুনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললো– ভাইয়া একটা রিক্সার ব্যবস্থা করে দিন না?

রিক্সা এলো, রুনী চলে গেল।

পরের দিন সকাল বেলা ছোট্ট একটা চিঠি পেলাম। রুনী তার বান্ধবীর ছোট ভাইকে দিয়ে পাঠিয়েছে, লিখেছে–

সুজন ভাই,
শুভেচ্ছা নিবেন। আজ বিকেল চারটার দিকে আমার সাথে দেখা করবেন। অবশ্যই কিন্তু, বিশেষ দরকার আছে। সাক্ষাতে সবই বলবো– সময়মতো গেটে অপেক্ষা করবো।

'রুনী'

বিকেল চারটা-পাঁচ মিনিটে রুনীর হলের সামনে গেলাম। দেখি রুনী ঠিকই গেটে অপেক্ষা করছে। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূরে চলে গেলাম। নরম ঘাসের উপর দুজনে সামনাসামনি বসে আছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জন্য খবর দিয়েছিলে?

– এমনিতেই, কেন জানি কাল আপনাদের হল থেকে ফিরে এসে মোটেই ভালো লাগছিল না। অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে উঠে একাকী কাটিয়েছি। ভাবছিলাম, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারলে কিছুটা ভালো লাগবে। তাই দেখা করতে লিখেছিলাম। রুনী একবারে অনেক কথা বলে গেল।

বললাম– কাল খেলা করতে করতে অমন আনমনা হয়ে গেলে কেন?

ও বললো– মানুষ এমন হবে কেন? জানেন সুজন ভাই, আমার শুধু ভাবতেই ভালো লাগে। কী যে ভাবি নিজেও বুঝিনে। ও আমাকে বিশ্বাস করে না। আমি ওকে ভালোবাসি, ও বুঝতে চায় না, কেন বোঝে না? শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আমার জন্য একটুও ভাবে না। আমি যা কল্পনাও করিনে, ও শুধু তাই করে– হিট দিয়ে কথা বলে। ভাবে না, আমার মনটা চুরমার হয়ে যাবে, না থাকবে। আপনি তো জানেন, এখানে আসার পর আমি মেডিক্যালে চান্স পেয়েছিলাম। বিভিন্ন অজুহাতে বাপ-মাকে বুঝিয়ে যাইনি। শুধু তাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না জেনে। ওর কাছে কী এর কোনোই মূল্য নেই? রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। শুধুই ভাবি আর ভাবি। আমার তো করার আর কিছুই নেই। ও কি চিরদিন এমনই থাকবে, না আমাকে বুঝতে শিখবে? শুধু অবজ্ঞা এবং উদাসীনতা। ভিতরে মন বলে কিছু আছে কিনা বুঝিনে। একবার ভাবি ভুলে যাব। কিন্তু ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ? আর মন? সে তো একবারই একজনকেই দেয়া যায়– বার বার তো আর জনে জনে দেয়া যায় না। মন ভেঙে যায়, রাতে শুয়ে শুয়ে কল্পনার জাল বুনি, আবার গড়ি। আবার তাই ছুটে যাই তার সাথে দেখা করতে কিংবা খবর দিই।

আমার মনে হলো রুনী ঠিকই বলছে। সে যেন আমার মনের কথা সবই জানে, আমার কথাগুলোই সে যেন বলছে। ইচ্ছে করলেই জনে জনে প্রতিদিন বন্ধুত্ব করা যায় না। আবার একজনকে একবার আপন ভাবলে, নিজের করে নিলে, সামান্য ঘটনাতেই তাকে দূরে ফেলে দেয়া যায় না। তার স্মৃতি, তার প্রতি মমত্ববোধ অন্তরে কাজ করে। মন ফিরে আসে, তবু বার বার ফিরে চায়। তার কাছ থেকে আঘাত পেলে, স্বার্থপরতা দেখলেও নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যায় না। তবু তার সাথেই আবার চলতে হয়, হাসতে হয়, আপন ভাবতে হয়। মনের অজান্তেই মনের গভীরে কোথায় যেন একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়। একটু আঘাতেই সেই পুরনো ক্ষত থেকে রক্ত

ঝরে। ক্ষতটা আবার শুকিয়ে যায়। কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে জোড়া দেয়ার মতো। জোড়া দেয়া যায় বটে, কিন্তু সেলাইয়ের দাগটা মোছা যায় না। কী বিচিত্র এই মন!

রুনী বলে চলেছে– একবার ভাবি ওকে ভুলে যাব। দ্বিতীয়বার আর কাউকে মন দেব না– বিয়ে করবো না– চিরদিন এভাবেই কাটাবো। কিন্তু যখন কল্পনা করি তখন ভাবি, প্রত্যেক নারীই মা হবার স্বপ্ন দেখে। তাই আর পারিনে, ওর কাছেই ফিরে যেতে হয়। ও আমাকে বুঝবে, আপন করে নেবে, আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে– এ বিশ্বাস যেন আমি কখনই পাইনে। তাই বার বার ওকে সন্দেহ করি, অনেক প্রশ্ন করি। কোনোটার উত্তর দেয়, আবার কখনো চুপ করে থাকে। সেদিন হয়েছে কি জানেন– দশটার দিকে ডিপার্টমেন্টে এসেছি, ওর সঙ্গে দেখা। এক জায়গায় বসে গল্প করছি। ও বললো– 'চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি।' শো একটায় আরম্ভ। তাছাড়া সিনেমা হল এখান থেকে চার মাইল দূরে। পৌনে এগারোটায় এখান থেকে বের হলাম। সকালে নাস্তা করেছি মাত্র। ভাবলাম, দুজনে দুপুরে কিছু খেয়ে নেব। সোয়া বারোটার সময় এক হোটেলে গিয়ে বসলাম। ও ভাতের অর্ডার দিল। আমাকে একবার বললো, 'কিছু খাবে'? আমি উত্তর দিলাম, 'তুমি খাও'। ও খেতে লেগে গেল। আর একবারও জিজ্ঞেস করলো না। আমি সামনের টেবিলে বসে থাকলাম। দুজনেই সকালে নাস্তা করেছি– তার খিদে পেয়েছে। সে কি একটুও বুঝলো না যে, আমারও খিদে পেয়েছে। আমার পেট শূন্য পড়ে রইলো। দুজনে হোটেল ছেড়ে হলে এসে ঢুকলাম। সিনেমা দেখলাম– জানিনে সে কী আনন্দ পেল! খিদের জ্বালায় কি দেখেছিলাম মনে নেই। রুমে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল। সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে।

বললাম– দেখো রুনী, আমার বলার কিছু নেই। তুমি তো সবই জানো। এমন অবস্থা তো আমার সঙ্গেও অনেক আছে। এ তো একই নদীর দুটো ধারা। তোমাদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন, আমার বন্ধুত্ব। তবে যা-ই হোক, এতদিনে আমার পরিচয় তো যথেষ্ট পেয়েছ। আমি এটুকু বলতে পারি যতদিন আছি, তোমাদের উভয়ের কল্যাণ কামনা করে যাব। তোমরা সুখের ঘর বাঁধবে, আমি তা দেখতে চাই। এতেই আমার আনন্দ। আমি ভবঘুরে মনের মানুষ, অন্যের সুখ দেখে তৃপ্তি পেতে চাই। ভোগের তুলনায় ত্যাগেই

আনন্দ বেশি। হয়তো কামালের এমন উদাসীন ভাবটা চিরদিন থাকবে না। হয়তো তখন তোমাকে বুঝতে শিখবে।

সন্ধ্যা লেগে এসেছে। রুনীকে ওদের গেট পর্যন্ত রেখে হলে ফিরে এলাম। এসে দেখি কামাল রুমে বসে আছে। আমাকে প্রশ্ন করলো– কোথায় গিয়েছিলে?

– রুনী খবর দিয়েছিল, তাই দেখা করতে গিয়েছিলাম।

– কী বলছিল? ও আবার প্রশ্ন করলো।

– তেমন জটিল কিছু নয়, অনেক কথাই বলছিল। তবে তুমি তাকে বুঝতে চাও না– তাও বলছিল।

কামাল বললো– জানো সুজন, আমি নিজেকে যেন কিছুতেই বুঝতে পারিনে। আমি জানি রুনী আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। ওকে নিয়েও আমি ভাবি। কোনো ভাবনা যেন স্থায়ী হয় না। কখন কী ভাবি, কী হয়; কোনো কিছুই যেন গভীরভাবে ভাবতে আমার ভালো লাগে না। যেমন তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। জানি তোমার মতো বন্ধু আমার বিরল, কিন্তু আমার করার কিছু নেই। নিজেকে যেন কোনোক্রমেই ফুটিয়ে তুলতে পারিনে, তোমাদেরকে বোঝাতে পারিনে আমার অনুভূতি।

বললাম– যা-ই বলো, তোমার কিন্তু অনুভূতি কম– এটা সবাই বলে।

– তা বলতে পারো, সেটা আমিও জানি। ও বললো।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে পড়ায় মন দিলাম। কামাল বাইরে বেরিয়ে গেল।

৯.

রাত বারোটা বেজে গেছে। কামাল পাশে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আমার ঘুম আসছে না, ভাবছি– কী যেন ভাবছি! এই দিন, এই রাত– সব চলে যাবে। এই তো সেদিনের কথা। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিলাম। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে হলো মাস। তারপর আজ চারটা বছর হতে

চললো। আগামী বছর বিদায় নেব। এই রুম এখানেই পড়ে থাকবে। এই খাটে সুজন-কামাল আর শুয়ে থাকবে না। এই রুমের ঠিকানায় সুজনের নামে চিঠি আর আসবে না। শেলফের গায়ে লেখা এ নাম মুছে যাবে। স্থান করে নেবে অন্য নাম। হয়তো দশ বছর পর কোনো বিশেষ কাজে ভার্সিটিতে এসেছি। এই দিনগুলোর কথা স্মৃতিপটে আঁকতে আঁকতে হয়তো এই রুমের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দেখবো, সবই অপরিচিত মুখ। যদি নিতান্ত এই রুমটিতেই ঢুকি, তখন নিশ্চয়ই রুমের কেউ ফিরে তাকাবে। বলবে, ভাই কাকে চান? কিংবা অন্য কিছু। ভাববে, রুমটা যেন তারই। আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি। তখন হয়তো মনে পড়বে রুনীর কথা, কামালের কথা। এই রুমের এই যে জায়গাটিতে বসে কতবার খেয়েছি, এখানে বসে পড়েছি– মনের মতো করে টেবিল গুছিয়েছি, সাজিয়েছি। ঐ জায়গাটায় রুনী এসে প্রায় বসতো– কথা বলতাম। আজ আর রুনী নেই, কামালও নেই। মশারির স্ট্যান্ড সেট করতে গিয়ে খাটের কোনাটা ভেঙে গিয়েছিল। ভাঙাটা আজও রয়ে গেছে। আমার স্মৃতিকে ধরে রেখেছে, নতুন ছেলেটা জানে না খাটের কোনাটা কীভাবে ভেঙেছিল, কে ভেঙেছিল। রুমের ছেলেটা আমার মনের কথা কিছুই বুঝবে না। শুধু জানতে চাইবে আমার বাড়ি কোথায়, কী করি ইত্যাদি। এক সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হয়তো রুম থেকে বেরিয়ে আসবো। ভাববো, এ রুম যে আজ আর আমার নয়, আজ আমি পুরনো, আমি অপরিচিত। একটাই নিশ্চল রুম অথচ অগ্রসরমান জীবন পরম্পরায় ভিন্ন ভিন্ন চলমান স্মৃতির অকথিত অনিবার স্রোতধারা। এমনি করে দিনে দিনে ধুলোর মাঝে জীবনের অবলুপ্তি। পরবর্তী পর্যায়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নামে পরিচিত।

কী যে ভাবছি! মোটেই ভালো লাগছে না। ঘুমোতে চেষ্টা করছি, ঘুম আসছে না। কেন এমন হচ্ছে? আলোটা জ্বাললাম। হাতের স্পর্শে খাতা মেলে গেল। কলম ধরেছি–

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন– এই তো অবনীর চিররীতি,
আসা আর যাওয়া, কাঁদা আর হাসা, নেই কোনো মিনতি।
জীবনের পাতা হতে কয়েকটি ছন্দ তুলে নিয়ে তারই মালা,
গলে ভরে সারাটি জনম তারই নিয়েই শুধু খেলা।

সে খেলার অবসান,
থেমে আসে সকল হাসি গান।
ধরা তলের এই মায়াজাল হতে সকল ছিন্ন করি,
কুড়িয়ে নিই জীবন পারের অচিন শায়রি।
সমাপ্ত করি কাজের শেষে ফেলে জীবন মেলা,
পরপারের নদে সাঙ্গ করি ভাসিয়ে মনের ভেলা।

আলোটা নিভিয়ে আবার শুলাম। আবার কল্পনার জাল বুনছি। এমনি করে মনের অজান্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। চোখ খুলে দেখি, ভোরের আলো জানালা দিয়ে ঢুকেছে। নির্মল বাতাস ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে।

ভালোবাসার গভীরতা যেখানে যত বেশি, ঠুনকো কথাতেই সেখানে মান অভিমানও তত বেশি। আর এই ঠুনকো কথার মধ্যেই যেন সমস্ত হৃদয়ব্যথা নিহিত। এই হৃদয়ব্যথা মানেই তো ভালোবাসা। যে প্রেমে হৃদয়ব্যথা নেই, সে প্রেম তো প্রেম নয়। বিরহ আছে বলেই তো প্রেম এত মধুময়।

পরীক্ষা শেষ, বাড়ি চলে আসতে হবে। কদিন ধরে কামালের সঙ্গে যেন মনোমালিন্য হয়েই চলেছে। তার কতগুলো কাজ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনে। এ কথা রুনীও বুঝতে পেরেছে। পার্টিতে ঢুকে কামাল অনেক অন্যায় করে চলেছে, যেগুলোকে সে নিজেই একদিন অন্যায় বলতো এবং ঘৃণাও করতো। আজ সে নিজেই সেগুলো করছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে। শুনলাম হলের সিট বণ্টন নিয়ে সে বেশ কিছু ছাত্রের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়েছে। বলতে গেলে তর্ক লেগে যায়। তবু আমি চাই সে অন্যায় থেকে দূরে থাক। তর্ক করে ক্ষণিকের জন্য জয়ী হওয়া যায় বটে কিন্তু সে জয় দীর্ঘস্থায়ী নয়। আত্মজিজ্ঞাসায় জয়ী হওয়াই প্রকৃত জয়।

বিকেলে রুনীর সাথে দেখা করতে গেলাম। বাড়ি চলে আসবো। কতদিনে আবার দেখা হবে বলা যায় না, তাই দেখা করা দরকার। রুনী এলো– ওর চোখে-মুখে বেদনার ছাপ।

– কী হয়েছে রুনী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বললো– সুজন ভাই, গতকাল বিকেলে কামালের সাথে বেশ কিছুটা মনকষাকষি হয়ে গেছে– আমাদের বিভাগে ছবি ওঠা নিয়ে। ও আমাকে শুধু ভুল বোঝে, আঘাত দিয়ে কথা বলে। আমার উপর রাগ করে আমার দেয়া চিঠিগুলো ও আমাকে ফেরত দিয়েছিল। আমি নিয়ে রুমে ফিরে এসেছিলাম। আসার সময় আমাকে চিঠিগুলো ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। আমিও জেদ ধরে শেষে আর তার অনুরোধ শুনিনি, ফলে ও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

বললাম– তুমি হেরে যাও, ও জিতে যাক, ওকে জিততে দাও। রুনী বললো– দেখুন সুজন ভাই, আমাদের এই সম্পর্কের আগে আমি আমার ইতিবৃত্ত ওকে সবই বলেছি, কিছুই বাকি রাখিনি। কিন্তু এখন অমন করে কেন?

কথাবার্তা অনেক হতে লাগলো। আমি ওকে বুঝ দিচ্ছি। তবু আমার মনের মধ্যে যে কামাল সম্বন্ধে অনেক দ্বিরুক্তি আছে তা রুনী ওয়াকিবহাল। কথায় কথায় রুনীকে বললাম– আগামীকাল বাড়িতে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।

ও বললো– কাল সকালে আপনার রুমে বিদায় জানাতে আসবো, কেমন?

বললাম– নিশ্চয়ই আসবে।

রুমে চলে এলাম। আমার সঙ্গে বাড়ি আসার জন্য বলায় কামাল বললো– পার্টির বিশেষ কাজ আছে, সুতরাং এখন বাড়ি যাওয়া সম্ভব হবে না।

রাতে দুজনে খেয়ে এলাম। সবকিছু গুছিয়ে রেডি করে রাখলাম। এখন শুধু যাওয়ার অপেক্ষা। দুজনে রুমে বসে আছি। একদলে সাত-আট জন ছেলে রুমে ঢুকলো। মুখ দেখে চিনে ফেললাম। ওরা কামালের পার্টিরই বিদ্রোহী গ্রুপের কয়েকজন। কামালের উপর মেন্টাল টর্চারিং আরম্ভ হয়ে গেল। আমি চুপচাপ বসে আছি, শুধু সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছি, কখন ওরা কামালের গায়ে হাত তোলে। অনেক কথা কাটাকাটির পর হুমকি দিয়ে সবাই বের হয়ে গেল।

রাতে শুয়ে আছি। ভাবছি, হলে কামালের গ্রুপের তেমন কেউ এ সময় নেই, বিশেষ কাজে বাইরে গেছে। এমতাবস্থায় আমার বাড়ি যাওয়া মানে

কামালকে একাকী যমের মুখে ঠেলে দেয়া। সুতরাং মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম– বাড়ি যাওয়া আপাতত বন্ধ।

কামাল সকালবেলা বুঝতে পেরেছে আমি বাড়ি যাচ্ছিনে। তার মনে ভয় যতই থাকুক, সৌজন্যের খাতিরে হলেও আমাকে বার বার বাড়ি যাওয়ার জন্য বলতে লাগলো। আমি সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম। তাছাড়া সকালে কয়েকটা ছেলেকে দিয়ে প্রতিপক্ষ গ্রুপকে বেশ কড়াভাবে পাল্টা হুমকি দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। এতে তারাও বুঝলো, বর্তমানে এরা সংখ্যায় কম হলেও শক্তিতে কম নয়।

সকাল নটা না বাজতেই রুনী রুমে এসে হাজির, বিদায় দিতে এসেছে। মনে মনে হাসতে লাগলাম। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। আমার কোনো ব্যস্ততা নেই। তার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে, আমার আজ বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললাম, বিশেষ দরকারে আবার কয়েকদিন থাকতে হচ্ছে। কামালের বিপদ সম্পর্কে ওকে কিছু বললাম না। মেয়েমানুষ, বিপদ-টিপদের কথা শুনলে ঘাবড়ে যেতে পারে, শেষে হাত ধরে বলে বসতে পারে, 'কামালকে নিয়ে বাড়ি পলায়ন করুন।'

রুনী বললো– কিন্তু আমি যে গত রাতে একটা চিঠি লিখেছি, এখানে আসার আগে বাড়ির ঠিকানায় পোস্ট করে এসেছি, কার হাতে গিয়ে পড়ে কে জানে!

– গোপন কিছু লেখা আছে নাকি? জিজ্ঞেস করলাম।

ও বললো– তা তো বটেই।

বিকেল সাড়ে চারটার দিকে রুনী বিদায় নিল। যাবার সময় বললো– ভাইয়া, আপনার জন্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে এসেছিলাম, রেখে দিন।

দেখি, কাগজে মোড়া দুটো বই, দুটো রাইটিং প্যাড ও একটা কলম– ব্যাগ থেকে বের করলো।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর কামালকে উঠে শার্ট-প্যান্ট পরতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম– কোথায় যাবে?

উত্তর দিলো– শহরে।

কামাল বেরিয়ে পড়লো। আমি রুমেই শুয়ে আছি।

বিকেল হয়ে গেছে। দরজায় কে যেন একাধারে কড়া নাড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম– কে?

উত্তর এলো– কামাল এক্সিডেন্ট করেছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরোলাম। দেখি, কামাল রিক্সায়, আরেকটা ছেলে ধরে রেখেছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম, শহর থেকে ফেরার পথে চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল। বাসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে পাশে ঝুলে পড়েছিল। আঘাত বেশি পেয়েছে হাঁটুতে। কয়েক জায়গায় পাকা রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরের ঘর্ষণে মাংস উঠে গেছে। ভাগ্যিস বাসের পিছনের দরজায় পড়ে গিয়েছিল, সামনের দরজায় হলে হয়তো পিছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ওখানেই ভবলীলা সাঙ্গ করতো।

দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে ফোন করলাম অ্যাম্বুলেন্সের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যে এ্যম্বুলেন্স হাজির হয়ে গেল। হাসপাতালে নিয়ে চললাম, কামাল আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে। দু-জায়গায় এক্সরে করলো। কোথাও ভাঙেনি, তবে আঘাত লেগেছে ভীষণ। ক্ষতস্থানগুলোতে ওষুধ লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ করে, কিছু খাবার ওষুধ দিয়ে দিলো। ওকে নিয়ে রুমে চলে এলাম। কামাল এখন সম্পূর্ণ শয্যাগত। নিজের চেষ্টায় পাশ ফিরে শোবারও অবস্থা নেই। তার যন্ত্রণা দেখলে কার না হৃদয় সহানুভূতিতে ভরে যায়!

রাত এলো, আমি পাশে বসে আছি। কামালের একবার একটু তন্দ্রা আসছে আবার জেগে উঠছে, কাতরাচ্ছে। আমি মাথায় বাতাস দিচ্ছি। ওষুধ খাওয়াচ্ছি।

হলগুলোতে রুম মেট কিংবা কোনো বন্ধু মানে জীবনবন্ধু, বিপদের বন্ধু, চলার পথের সাথী, সাথীহারা জীবনের সাথী। কখনো মা-বাপের স্থলাভিষিক্ত। শুনেছি বিপদের রাত নাকি শেষ হতে চায় না। সমস্ত হলে টুঁ-শব্দটা পর্যন্ত নেই। নিশুতি রাত। সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। শুধু যেন একটি প্রাণী কামালকে পাশে নিয়ে বিনিদ্র রাত পার করছি। যা ভাবছি, তা সব ভাষায় সাজিয়ে বলা কঠিন। মাঝে মাঝে নিজের কাছেই প্রশ্ন আসছে– হ্যাঁ, এই কি আমি ভাবছি? না, এটা না, অন্য কিছু। নিজেই ভাবনার খেই

হারিয়ে ফেলছি। কল্পনার জগতে চলে গেছি। হলের পাশের আমগাছটায় থেকে থেকে পেঁচা ডাকছে; বার বার যেন অমঙ্গলের সুর কানে আসছে। ভাবছি, যদি আজ বাড়িতে চলে যেতাম, তবে কী হতো? এতক্ষণ হয়তো আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমোতাম। কিছুই জানতাম না। আর কামাল এই বিছানায় শুয়ে একাকী কাতরাতো, আর ছটফট করতো। কী কষ্টই না করতো! যদি এমন হতো, কামাল বাসের চাকার নিচে পড়ে পিষ্ট হয়ে যেত, এই সুন্দর মুখটা রাস্তায় হারিয়ে যেত- তখন কেমন হতো? কী সান্ত্বনা দিতাম রুনীকে? কী হতো রুনীর!

নিজেকে ফিরিয়ে নিচ্ছি, মনে মনে বলছি– দূর ছাই! তা হবে কেন? মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে, কামালের এই ব্যথাকে আমি যদি শুষে নিয়ে বেশ কিছুটা লাঘব করতে পারতাম, তবে কিছুটা হলেও শান্তি পেতাম। বন্ধুত্বের প্রতিদান রেখে যেতে পারতাম। এমনি কত কথা, কত ব্যথা হৃদয়মাঝে স্পন্দিত হতে লাগলো।

এই নিশীথে খোদার কাছে দোয়া মাঙতে লাগলাম– খোদা, কামালের ব্যথাকে উপশম করে দাও!

সেদিনের সেই নিশীথে খোদা আমার মনের এই ভাষা, আমার প্রাণের এই গভীর আকুতি, হৃদয় নিংড়ানো প্রার্থনা শুনেছিল কিনা জানিনে, তবে যার জন্য আমার এত ব্যথা, এত মনোকষ্ট, এত মমতা, সে কি একবারও আমাকে চিনেছে? ভেবেছে কি আমাকে নিয়ে? সবই বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে। আর আমি এই পুঞ্জীভূত ব্যথা বুকে ধরে স্বাক্ষীগোপাল হয়ে আজ মরণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছি।

১০.

কথা কয়টা বলতে বলতে দাদু যেন নির্বাক হয়ে গেলেন। চাঁদ ততক্ষণে আমাদের নারকেল গাছের মাথা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। দাদু সেদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। যেন সমস্ত চাঁদটাজুড়ে কামালের মুখচ্ছবিটা ফুটে উঠেছে, আর দাদু প্রাণভরে তার সেই অতি পরিচিত মুখ একদৃষ্টে অবলোকন

করছেন। এ মুখ যেন দীর্ঘদিনের হারানো সেই চেনা মুখ। আজ শরতের এই পূর্ণিমার চাঁদের মাঝে এতদিনে তা খুঁজে পেয়েছেন।

কিছুক্ষণ পর আমি বললাম– দাদু তারপর?

রাত কেটে গেল। পরের দিন সকালবেলা রুনী সংবাদ পেয়ে রুমে এলো। নীরবে অশ্রুপ্লুত করুণায় ভরিয়ে তুললো। সারাদিন পাশে থাকলো। সময় শেষে চলে যেতে হলো হলে। হয়তো তার মনের মধ্যে কথাটা বার বার গুমরে মরছিল– আজ রাতে যদি কামালের পাশে থাকতে পারতাম– ওকে সেবা করতে পেরে ধন্য হতাম। যাবার সময় আমাকে অনুরোধ করে বলেছিল– সুজন ভাই, কামাল রইলো আর আপনি রইলেন। ওকে দেখবেন, আমার দায়িত্ব আজ আপনাকে পালন করতে হবে।

আমি শুধু বলেছি– দেখবো, তুমি ভালো থেকো।

রাতের মধ্যেই ব্যথা কিছুটা কমেছে। ধরলে উঠতে পারছে, বসতে পারছে। প্রকৃতির তাগিদে বাইরে যেতে হলে আমি হয়েছি লাঠি, হয়েছি তার বাহন।

পরদিন সকাল। আমার শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। পর পর দুরাত জাগা, তাছাড়া খাওয়া-দাওয়ার তেমন ঠিক নেই। আগের সেই অবস্থায় ধরেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, ব্যথাও অনুভব করছি। টনসিলটা ফুলেছে, বেশ ব্যথা। থুতু গিলতে গেলেও ব্যথা অনুভব করছি। তাছাড়া পেটে গ্যাস জমেছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে। কিন্তু আমার এ অবস্থা এ মুহূর্তে কাকে বলি! কামালকে নিয়েই ব্যস্ত।

সকাল সাড়ে-নটার দিকে রিক্সায় করে ওকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। কম্পাউন্ডার ব্যান্ডেজ খুলে পরিষ্কার করে আবার ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিল। ওকে নিয়ে আবার রুমে ফিরলাম। আমার যেন রুমে ফেরার তর সইছে না, নিজেকে নিয়ে আর একেবারেই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিনে। কামালকে তার বেডে পৌঁছে দিয়ে অন্য বেডে শুয়ে পড়লাম। হাত-মুখ আর ধোয়া হলো না। কম্বলটা দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে নিলাম। আমার সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরছে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কখন দুপুর হয়েছে জানিনে। কামাল ডাইনিং বয়কে দিয়ে খাবার আনিয়েছে। আমার ভালো লাগছে না– খাব না, বলে শুয়েই আছি।

কিছুক্ষণ পর কামাল বললো– সুজন, যাও শহরের বার চেম্বারে ফোনটা করে এসো। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আবার বললো। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না, যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে একটা কথাই বললাম– আমি পারছিনে।

বুঝলাম উত্তরে কামাল সন্তুষ্ট হলো না, তবুও কোনো কথা না বলে আমি শুয়েই রইলাম।

একটু পরে বাইরের একটা ছেলেকে ডেকে তার কাঁধে ভর করে কামাল অফিসের দিকে গেল। বুঝলাম ফোন করতে যাচ্ছে। যাবার সময় শুধু একটা কথাই বললো– সবাইকে চিনেছি, জগতে কেউ কারো নয়।

কথাটা নিয়ে বাড়াবাড়ির সময় তখন আমার ছিল না, তাই গুরুত্ব দিলাম না। একবার মনে মনে ভাবলাম– কী-ই বা এমন গুরুত্ব, সবই তো আমি জানি। ফোনটা বিকেলে করলেই হতো।

কামাল ফিরে এসে কতগুলো ছেলেকে নিয়ে বেডে বসে গল্প করতে লাগলো। আমি শুয়েই আছি। দাঁতের মাড়িটা যেন বেশ ফুলেছে, মুখখানাও নাড়াতে পারছিনে। অন্যদিকে ফিরে শুয়ে আছি। কখন জানি ছেলেগুলোও চলে গেছে। দুপুরে খাওয়া হয়নি। ওঠার ক্ষমতা হচ্ছে না যেন। পেটটা চোঁ চোঁ করছে, তবু শুয়ে আছি, মাথার অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে বিভোর করে তুলেছে।

বিকেলে রুনী রুমে এলো। কামাল শুয়ে আছে। কামালের পাশে বসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো– এখন কেমন আছো? সুজন ভাইয়ের কী হয়েছে? শুয়ে আছে কেন?

কামাল নিজেকে নিয়ে কিছুই বললো না, কেবল বললো– কী জানি অতসব জানিনে। পরাধীনতার মতো জীবন আর নেই, জগতে কেউ কারো নয়, সবাইকেই চিনলাম। রাতে শুনেছিলাম চোয়ালে নাকি ব্যথা হয়েছিল, আক্কেল মাড়ি উঠছে হয়তো।

কথাটা শুনে কেন জানি মনে দাগ কাটলো এবং ভীষণভাবেই দাগ কাটলো। ভাবছি, তাহলে জগতে কেউ কারো নয়? কিন্তু আমি তো তার হতে

চেয়েছিলাম, তার জন্য করতে চেয়েছি, যতটুকু পারি করেছি, ভেবেছি। তাহলে এ দুদিনের এত ভাবনাচিন্তা সবই বৃথা? অন্তত একটাবার আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল– সুজন, কী হয়েছে তোমার, কেমন লাগছে? কিংবা দুপুরে কিছু খেলে না কেন?

তা তো নয়, বরং আমার উপর উল্টো রাগ! হয়তো তার কাজটা করতে পারিনি বলেই। করতে পারলে নিশ্চয়ই ভালো থাকতে পারতাম। দীর্ঘ চারটা বছরে কামালকে আগলে রেখেছি, সাধ্যমতো সহযোগিতা করছি, বিপদে পাশে দাঁড়াচ্ছি কিন্তু আজ কেন সহসাই সে বুঝতে পারলো 'জগতে কেউ কারো নয়'। তাহলে কি ওর কথাই ঠিক 'জগতে কেউ কারো নয়'?

কথাগুলো নিজেকে জিজ্ঞেস করছি, আর মনে মনে উত্তর খুঁজছি।

রুনী এসে পাশে বসলো, মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো– সুজন ভাই, খুব মাথা ধরেছে? আপনার সত্যিই কি আক্কেল মাড়ি উঠছে? কেমন লাগছে?

আমি অল্প কথায় উত্তর দিলাম– ভালো লাগছে না। আক্কেল মাড়ি উঠছে না, একটু আগে উঠলো, মুখে নয়, মনে গজালো।

কথাটা ও ভালোভাবে বুঝতে পারলো বলে মনে হলো না। অনেকক্ষণ বসে থেকে একথা-সেকথার শেষে সন্ধ্যার আগে বিদায় নিলো।

কামালের সঙ্গে আর কোনো কথা হয়নি। শুয়েই আছি। হয়তো অজান্তেই ঘুমিয়ে গিয়েছি। রাতে কামাল কি খেয়েছে জানিনে। বেশ রাত। একটা পাউরুটি ও একটা কলা বাইরে থেকে আনিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখে আর ঘুম নেই। আকাশ-পাতাল ভাবছি। ভাবনার মালা গাঁথছি। ভাবছি, পরীক্ষা তো শেষ। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। মাস্টার্সে ভর্তি হবার জন্য কি আবার আসবো? কবে রেজাল্ট হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার মতো ভবঘুরে মনের মানুষ কখন কী ভাবি তারও কোনো ইয়ত্তা নেই। কখন কী করি বলা কঠিন। যেখানেই থাকি, কাউকে না কাউকে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে মায়াজালে বেঁধে ফেলি। মনে হয়, এই-ই জীবনে সবকিছু। এই যাযাবর জীবন নিয়ে আবার কি এখানে ফিরে আসা হবে! আবার হয়তো তাঁবু খাটাতে হবে অন্য কোনো পথের বাঁকে। অন্য কোনো দৃশ্যপট চোখে ভাসবে। অন্য কোনো পথে চলতে হবে, অন্য কাউকে আপন ভাবতে হবে।

কিন্তু আমি তো পথহারা এক বেভুল-পথিক। আমার যে পথের কোনো ঠিকানা জানা নেই। আমি তো আমার জীবন ঘুড়ির নাটাই কোথাও বাঁধা রেখে আকাশে পতপত করে উড়তে চাইনে, আমি সুতা-কাটা ঘুড়ির মতো এ-পথে ও-পথে উন্মুক্ত আকাশে ঠিকানাহীন পথে উড়তে চাই। কামালকে তো আপন করে নিতে চেয়েছিলাম, আপন ভাবতে শিখেছিলাম। কিন্তু তাই-বা কই! চাতক তো মেঘের আশায় একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকে, কিন্তু মেঘ কি কখনো চাতকের কথা ভাবে! আর ভাবলে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে বেড়াতে পারতো না, এক ফোটা পানি চাতকের মুখে দিয়েই যেত। কিন্তু রুনী, রুনী কি আমাকে আপন ভাবতে শিখেছে? কামালকে বাদ দিয়ে রুনীর কাছে কি আমার কোনো অস্তিত্ব আছে? রুনীর কাছে আমি তো পরগাছার মতো বেঁচে আছি। কিন্তু আমি তো রুনীকে ভালোবাসি, স্নেহ করি– কামনা করি তাদের আশা পূর্ণ হোক। দোয়া করি তারা যেন জীবনে ছোট্ট নীড় রচনা করতে পারে। আমি বেড়াতে যাব, দেখবো ওরা সুখে আছে– এই তো আমার শান্তি, এই তো আমার চাওয়া। ভবঘুরে মানুষের এর থেকে আর কীই-বা চাওয়া থাকতে পারে। কিন্তু রুনী কি আমাকে ভালো ভাবতে শিখেছে? না, কামালকে পেতে হলে আমার প্রয়োজন তাই আমাকে হাতে রেখেছে? আজ যদি রুনীর সাথে কামালের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে কি রুনীর সাথে আমার এ স্নেহভরা সম্পর্ক বজায় থাকবে? হয়তো না। এটাই বাস্তবতা, এটাই নিয়ম। তবু যে আমি তাকে স্নেহ করতে শিখেছি, তার মঙ্গল ভাবতে শিখেছি, আপন ভাবতে শিখেছি। যতদিন বেঁচে থাকি তার মঙ্গল কামনা করে যাব– দূরে থাকলেও তার অজান্তেই এসব করে যাব। বিদায় আমাকে নিতেই হবে। এভাবে মরীচিকার পিছে ছুটে লাভ কি? শুনেছি দুঃখ নাকি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে, কিন্তু আমাকে তো মনে হয় পঙ্গু করে দিচ্ছে। আমার দুঃখে কাউকে দুঃখী করতে চাইনে– তাই কষ্টের কথা কাউকে বলিনে। নিজের দুঃখ নিয়ে নিজেই বেঁচে থাকতে চাই, সামনে চলতে চাই।

রাত অনেক হয়েছে। হলের কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। কামালও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আমার মাথার ব্যথাটা একটু কম বলে মনে হচ্ছে। গলার ব্যথাটা আছে। খিদে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। উঠে এক গ্লাস পানি খেয়ে আবার শুলাম। শুয়ে অতীতের স্মৃতিমন্থন করছি, কী ভাবছি নির্দিষ্ট করে

বলা কঠিন। কেন জানি ঘুম আর আসছে না। খাতা-কলম হাতে নিলাম। লিখে চলেছি–

এবার তাহলে চলি সঙ্গিনী অতীতের কত কথা মনে পড়ে,
ফিরে যাও হে রঙ্গিনী কতবার ফিরিয়েছ আমারে।
যাচ্ছি এবার কামরুপ কামাখ্যায় যেখানে গেলে ফেরে না কেউ সশরীরে,
যদি ফেরে পাখির রূপে, নয়তো মণি-মুক্তো হীরে।
যদি ফিরি হয়তো দোয়েল, না-হয় শ্যামা হয়ে
না-হয় কোকিল ঘুঘু, না-হয় সবুজ টিয়ে।
শিস দেবো বসে যেখানে তোমার দখিন জানালায়,
ঢেকে পড়েছে তমালের ডালে সেই সে তরু-ছায়।
বাড়িয়ে দিলে দুহাত তোমার জানালার ওপাশ হতে
উড়ে যাব আমি সুদূর পারে সে এক অজানা পথে।
ফিরবো না আর এ জীবন মাঝে এটুকুই শুধু বলি,
এবার তাহলে চলি সঙ্গিনী– এবার তাহলে চলি।

১১.

ঘুম থেকে উঠতে সকাল আটটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে সকালে নাস্তা করে এলাম। কামালের জন্য নাস্তা নিয়ে এসে তার টেবিলে রাখলাম। শুয়ে আছি, ভাবছি– আর কি এখানে ফিরে আসা হবে? সব কিছু জোগাড়। বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। কামাল বেডে বালিশে হেলান দিয়ে আয়না দেখছে। কে কোথায় কী ভাবলো, কী আছে দরকার! তার চেয়ে অন্তত নিজের সৌন্দর্যচর্চায় মগ্ন থাকলেও কিছুটা লাভ।

ট্রেনের সময় হয়ে এলো। শার্ট-প্যান্ট পরে নিলাম। কামাল হয়তো ভাবছে বাইরে কোথাও যাব। তারপর কামালের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনের মধ্যে বার বার বলে উঠছে, যেন বলি– কেমন বোধ করছো? ব্যথাটা কেমন হয়েছে?

কিন্তু না, হাতখানা বাড়িয়ে কামালের হাতে দিলাম। তারপর সহসা মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে পড়লো– তাহলে আসি, কেমন?

কামাল যেন হতচকিত হয়ে পড়লো। বলে উঠলো– কোথায় যাবে, বাড়িতে? না, আজকে যাওয়া হবে না।

আমি কোনো কথা বললাম না। শুধু তার মুখের দিকে আরেকবার তাকালাম– সেই চিকন ঠোঁট, লম্বা নাক, সেই সুপরিচিত একজোড়া চোখ– আরেকবার দেখে নিলাম। ভাবাবেগ আমাকে তাড়িয়ে ফিরছিল। অনেক কষ্টে বাধা দিলাম। তারপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কামাল আমার বিদায় পথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো– জানিনে তখন সে কী ভাবছিল।

বাড়ি এসেছি। রাতে বিছানায় শুয়ে আছি। ছোট বোনটা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। বললো– একটা চিঠি এসেছে। দেখলাম, রুনী লিখেছে–

ভাইয়া,
আমার সালাম নেবেন। কেমন আছেন জানিনে– তবে ভালো থাকুন সেই কামনাই করি এবং করবো। আজ বিকেলে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, বিদায় নিতে। অনেকক্ষণ থাকলাম আপনার সাথে। শেষের দিকে বেশ চিন্তাযুক্ত ছিলাম। কারণ একটা কথাই মনে হচ্ছিল, কী আমার পরিণতি? ভবিষ্যতে কী হবে আমার? আজ নতুন নয়, বেশ কিছুদিন ধরেই আমি দুশ্চিন্তায় আছি। আপনাকে বোঝাতে পারবো না, কামালকে আমি কতো বেশি বিশ্বাস করতাম– চন্দ্র, সূর্যের মতোই। ওকে নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তা করতাম না। কতো রঙিন স্বপ্ন দেখতাম ওকে নিয়ে! এখনো দেখি কিন্তু আগের মতো নয়। কিছুদিন আগেও একশ'ভাগ নিশ্চয়তা আমার ছিল– কামাল শুধু আমারই; কিন্তু আজ আমি কোনো নিশ্চয়তাই দিতে পারিনে। আমি এখানে প্রথম এসেই ওকে অত্যন্ত আপন করে গ্রহণ করেছিলাম। কারণ, মনে কোনো দ্বিধা, ভয়, দুঃখ ছিল না। ওকে পেয়ে সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম। তাই প্রথমে এসেও এতটা খারাপ লাগেনি কিন্তু আজ আমি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। মানুষ কারো দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এমনভাবে প্রতারণা করতে পারে, আর তাও কামাল, আমার কল্পনাতীত ছিল; চরম বাস্তব।

জানেন ভাইয়া, আমার জীবনে এমন দিনও ছিল– একদিন নয়, দুদিন নয়

একটা বছর আমি হাসতে পারিনি– এটাও একটা চরম বাস্তবতা। আমার মনে হয় সেই দুঃখকে বুকে নিয়েও আমি এখনকার চেয়ে ভালো ছিলাম। কারণ তখন ছিলাম একটা নদীর কূলে। পাড়ি দিতে না পারার অক্ষমতা দুঃখ দিত ঠিকই কিন্তু এখন তো আমি মাঝনদীতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আপনিই বলুন, কোনটা ভালো? তারপর দুঃখকে মানিয়ে নিয়ে সবকিছু ভুলে ভাই-বোন নিয়ে বেশ ভালোই দিন যাচ্ছিল। এর মধ্যে আবির্ভাব হলো কামালের। নিজেকে বেশ সুখী মনে করেছিলাম কিছুদিন। রঙিন বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলাম। আবার আমি ফিরে এসেছি সেই ফেলে আসা হাসিহীন বছরটিতে। ঠিক তেমনিভাবে দুঃখকে নিয়ে থাকতে ভালো লাগে, না লেগে উপায় নেই। কিন্তু আমার তখনকার চেয়ে এখন আরও দশগুণ কষ্ট লাগে ভাইয়া। কারণ তখন ছিলাম কূলে, এখন নদীর মাঝখানে– অথচ বাঁচার কোনো অবলম্বন নেই। আশা না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমি কাকে নিয়ে কোন আশায় বেঁচে থাকবো? তাছাড়া বাড়িতে দুঃখকে নিয়ে চুপচাপ ভাবতে পারতাম, আর এখানে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। হাসতে হচ্ছে, গল্প করতে হচ্ছে, প্রতারণা করতে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু আর কতদিন কত সময় এভাবে প্রতারিত হব? মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠি, নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তখনই বলে ফেলি বা চিঠি লিখি, নিজেকে কিছুটা হাল্কা করি।

জানেন ভাইয়া, আমি জীবনে সৃষ্টিকর্তার কাছে দুটো জিনিস চেয়েছিলাম। এক, আমার লেখাপড়া; দুই, একটা সুন্দর অকৃত্রিম মন, যে আমাকে বুঝবে। জানি না তার কতটুকু পেয়েছি। এর চেয়ে বেশি কিছু চাইনি এবং চাইবো না। তাকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম। ভবিষ্যতেও ওকে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। কারণ আমি ওকে ভালোবাসি। চাওয়া-পাওয়া আছে ঠিকই কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে হলেও সারা জীবন আমি ভালোবেসে যাব। আমাকে দুঃখ দিলেও আমি ওকে ভালোবেসে যাব– ওর দোষ দেব না। কারণ আমি জানি আমার কপালে সুখ হবে না, দোষ আমার নিয়তির। মাঝে মাঝে মনে হয় কামালের হাসিখুশি জীবনের সাথে আমার মতো দুঃখিনীকে না জড়ানোই উচিত কিন্তু কিছু করার নেই। ওকে ছাড়া যে কিছুই ভাবতে পারিনে, মনে হয় পারবোও না।

আপনি আমার একটা কাজ করে দেবেন। সেটা হলো, আপনার ওখানে থাকতে কামাল যে একটা সিঙ্গেল ছবি উঠিয়েছিল, তার নেগেটিভ স্টুডিওতে আছে। আপনি ঐ নেগেটিভ থেকে ওর একটা বড় ছবি ওয়াশ করিয়ে আমাকে দেবেন। তবে ছবিটার কথা ওকে না বলাই ভালো।

আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি দুঃখ পাবেন না। ওকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন। ও শুধু আপনার বন্ধুই নয়, আপনার এক দুঃখিনী বোনের স্বামী। আমি চাই আপনাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক, যেমনিভাবে কোনো বোন চায় না তার স্বামীর সাথে ভাইয়ের মনোমালিন্য হোক।

আপনাকে আজ একটা কথা বলি। আমাকে কোনোদিন 'ভাবী' হিসেবে জানবেন না বা ভাববেন না, বোন হিসেবে ভাববেন। আপনি আপনার বোনের কাছে বিনা দ্বিধায় সব কথা বলতে পারেন। মানুষকে বিশ্বাস করবেন। শুধু একজনকে নিয়েই পৃথিবী নয়। দোষ-গুণ সবার ভিতরই থাকতে পারে– সংশোধন করার চেষ্টা করবেন আমাকে। আমি কামালের সাথে সারাজীবন সম্পর্ক রাখতে চাই বা চাইবো। তবে সে না-রাখলেও আপনার সাথে থাকবে। আমি হয়তো কোনোদিন কামালের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারবো না তবে কিছু না পেলেও তার স্মৃতি নিয়েই থাকবো। তার বন্ধু হিসেবে আপনিও আমার প্রিয় ভাইয়া হয়েই থাকবেন। তার অবর্তমানে বোনের খবর নিলে আরও খুশি হব। আজ আমার অবচেতন মনে দুঃখের উচ্ছ্বাসে অনেক কিছুই লিখে ফেললাম। অনুরোধ থাকবে বোনের ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে এবং আপনার উদারতার মাঝে স্থান দেবেন। যদি ইচ্ছে হয় তাহলে লিখবেন। আমার কামালকে দেখবেন। আমি মেয়ে তাই আমার পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব হয় না। আমার অসম্ভবটুকু আপনি দেখবেন। আবার দেখা হবে এই কামনা করে শেষ করছি।

'ছোট বোন রুনী'

চিঠিটা দুবার পড়লাম। মনটা ব্যথায় ভরপুর হয়ে গেল। রুনী আমার ছোট বোন? হ্যা, রুনীকে তো আমি ছোট বোনের মতোই দেখি। আচ্ছা, রুনী কি চিরদিন আমাকে এই রকম দেখবে? আজ কামাল যদি আমার পাশে না থাকে, তবেও কি রুনীর সাথে আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে? কিন্তু রুনী তো লিখেছে, 'সে সম্পর্ক না রাখতে চাইলেও আপনার সাথে থাকবে।' কিন্তু

আমি যদি কামালের পাশে না থাকি তখন তো আমাকে দিয়ে রুনীর কোনোই কাজ হবে না। সেদিন কি রুনী আমাকে ভুলে যাবে? না, ভাইয়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে? ফুলদানি যত দামীই হোক না কেন, গাছ ছাড়া কি ফুলদানিতে ফুল বেশিদিন সজীব থাকবে? তাহলে রুনী কি আমাকে ঠিকমতো বুঝেছে– না, এটা তার কৌশলমাত্র? আচ্ছা, রুনী যখন বিকেলে রুমে এসে শুনবে আমি তাকে না জানিয়ে বাড়ি চলে এসেছি, তখন কী ভাববে? হয়তো ভাববে তার চিঠি লেখা সম্পূর্ণ বৃথা হয়েছে, আমি তাকে ফাঁকি দিয়েছি। কিন্তু আমি কি সত্যিই তাকে ফাঁকি দিয়েছি?

এমনই অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন সকাল। সময় করে এক সময় রুনীকে লিখলাম–

রুনী,
স্নেহাশীষ নিও। বাড়ি এসে তোমার চিঠিটা অক্ষত অবস্থায় পেলাম। তুমি কেন আমাকে এমন বাঁধনে বাঁধতে গেলে? আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারবো?

হয়তো রুমে এসে জেনেছো, আমি কামাল থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। দেখো রুনী, ভাঙন-ধরা নদীর কূলে বসে কী আশাতে আমি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখবো, বলো? আমাকে কুড়িয়ে পাওয়া ফুল ভাবতে চেষ্টা করলে ভালো হয়। যেমন পথের ফুল মনের অজান্তেই আবার পথে ফেলে দেয়া হয়, তেমনটি।

তবে আমাকে যদি সত্যিকারভাবে পরগাছা না ভেবে আমার আলাদা অস্তিত্ব চিন্তা করতে পারো তবে আমি তোমার পাশে ভাই হিসেবে থাকবো, কথা দিচ্ছি। কামালের সাথে আমার বন্ধুত্ব অসম মনে হয়। সে ভোগে বিশ্বাসী, আমি ত্যাগে। তার সাথে আমার চিন্তাধারার দূরত্ব দিন দিন প্রগাঢ় হচ্ছে, মানসিক দ্বন্দ্বও প্রকট। সে বৈষয়িক, আমি নিঃস্বার্থমনা, নিভৃতচারী। সে রাজনীতিবিদ হবার স্বপ্ন দেখে। তার সতীর্থরা সাধারণ মানুষের কাঁধে ভর করে নিজ স্বার্থের জয়গানে মেতে ওঠে। মিথ্যার বেসাতি করে মানুষের আস্থার হাটে। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি যেখানে অনুপস্থিত, বিবেক সেখানে ভোঁতা। মানসিকতা যেখানে বিকৃত, মানবিকতা সেখানে উপেক্ষিত। পদ্মার তীরে অনেকবার গেছি। কামালের আচার-আচরণ অনেকটাই কীর্তিনাশা পদ্মার মতো। যখন বান ডাকে, দুপাশের সকল কীর্তিগুলোকে নির্দ্বিধায়,

উন্মাদনায়, মনের উল্লাসে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। আবার অসময়ে ধু-ধু বালির বিরান প্রান্তরে বসে প্রলাপ ধ্বনিতে হা-হুতাশে মুখর করে তোলে।

আমি ঘরছাড়া, সংসারত্যাগী মনোভাবে গড়া দূরান্ত-পথের এক পথিক। পথ চলাতেই আমার আনন্দ। পথে পথে পথ খুঁজে ফিরি, বেদুইন যাযাবর আমি– পথ খোঁজাই আমার নেশা। জীবনের মধ্যে জীবন খোঁজা আমার সাধনা। এ সাধনা আমার নিরন্তর। প্রতিটি জীবনকে বিশ্লেষণ করে অনুভূতি মিশিয়ে জীবন-জগতের স্বরূপকে আস্বাদন করতে চাই। অসীম জীবনের চেতনা আমার পাথেয়। আমি মুক্ত মনে পথের দিশা পেতে চাই। আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না।

ছয় বছর আগে যাত্রা-প্যান্ডেলে যাত্রা শুনতে গিয়ে কোনো এক ঘটনার হৃদয়বিদারক পরিণতিতে বিবেককে লম্বা সুরে টেনে-টেনে গাইতে শুনেছিলাম, 'পথিক আপন বুঝে চ-লো, এ-এ-এই বেলা-আ–'। সে সুরধ্বনি আমার কানে আজও অনুরণিত হয়। আশা করি তুমি বুঝবে। কামালের মনে তুমি স্থান করে নিতে পারলে, তাকে পেলে আমি পরিতৃপ্ত হবো।

শুভান্তে,
'সুজন ভাই'

বিকেলে পায়ে পায়ে মাঠের সেই বড় পুকুরটার পাড়ে গিয়ে বসলাম। কামালকে নিয়ে এখানে একদিন বসেছিলাম, স্মৃতিপটে দিনটা আঁকা রয়েছে। অনেকক্ষণ একাকী বসে আছি আনমনা হয়ে। সন্ধ্যা লেগে আসছে। একজন চাষী রেডিও হাতে গান বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরছে। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় গানের একাংশ কানে পৌঁছুলো, 'সারা জীবন, আপন করে যারে ভাবলি তুই সারা জীবন– আপন করে যারে ভাবলি, সে তো তোর নয়, তুই সারা জীবন ---।' সেই খেজুরগাছের চারাগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে। মাঝখানের চার-পাঁচ হাত জায়গা আজও শূন্য পড়ে আছে, যেখানে সেদিন নিতান্তই মনে হয়েছিল যেন চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ি। আজ আর দুজন নয়, মনে হচ্ছে সাথীবিহীন একাকীই যেন এই আবছা অন্ধকারে এই জায়গাটুকুতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। এই বিশাল পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র খেজুরের চারাগুলোর মাঝে আমি ঘুমিয়ে থাকবো অনন্তকাল ধরে। গাছের পাতাগুলো সারা রাত জেগে আমাকে বাতাস করবে। আমি অঘোরে

ঘুমাবো। যখন ঘুম ভেঙে দেখবো পূর্ণিমার চাঁদ পাতার ফাঁক দিয়ে আমার সাথে লুকোচুরি খেলায় মেতেছে– আমি ডাকবো তাদের হাতের ইশারায়। আমার ডাকে ওরা ধরা দেবে– আমি হাসবো– মন খুলে হাসবো। এ অসহনীয় মনোব্যথা আর সইতে হবে না। সবকিছু থেকেই মুক্তি পাব।

তা কি হয়? চলার পথ যে এখনো অনেক বাকি! জীবন যে সবে শুরু! মাঠের বিভিন্ন দিক থেকে শেয়ালের রব কানে আসছে– কি হুয়া, কি হুয়া! এই মাঠের মধ্যে একাকী বসে আছি। আজ যেন আমার ভয়-ভীতি বলতে কিছুই নেই। তবে কি আমি পাগল হয়ে যাব? কই না! এই তো বেশ বুঝতে পারছি, নিজের অস্তিত্বকে ঠিকই অনুভব করতে পারছি। শুধু একটাই দুঃখ কেউ আমাকে বুঝলো না, আমাকে কেউ বিশ্বাস করলো না। নিজের স্বার্থের দৃষ্টি দিয়েই কেবল আমাকে বিবেচনা করলো! এটাই আমার দুঃখ! সবই মায়া, সবই দুর্ভাবনা। এই চাওয়া-পাওয়া, এই অনুভূতি সবই আছে, থাকবে– রেখেছে আকীর্ণ করে মায়াময় এ বিশ্ব সংসার!

বেশ খিদে পেয়েছে। কী যেন ভাবতে ভাবতে ভাঙা-মন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এসে দেখি ওপাড়ার বাল্যবন্ধু রমা এসেছে। অনেকক্ষণ গল্প করে কাটালাম। যাবার সময় ও বললো– মনটা এত খারাপ কেন রে? কী হয়েছে?

আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। আরো দশদিন পর পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেল। দেখি, রুনী লিখেছে–

ভাইয়া,
জীবনে কতটুকু সার্থক হতে পেরেছি জানিনে, তবে এটুকু বলতে পারি আমি সার্থকতার নিশ্চয়তা নিয়ে কোনো কিছু করিনে, কারণ সেটা দুঃসাহস আর সৎসাহস যাই বলুন না কেন– তা এই ভাগ্যবতীর (?) নেই।

ভালোবাসা জিনিসটা মানুষকে বোঝানো যায় না। পৃথিবীর প্রত্যেককেই আমি বিশ্বাস করতে চাই। তবে অনেকে সেটা থেকে বঞ্চিত করে, তবুও আমার জীবনে এটা শেষ পর্যায় বলেই আমি মনে করি। এই পর্যায়ে এসে আপনাদের দুজনকে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি এবং বেশি অধিকার আছে বলে মনে করি। তবে তারই সাথে আমার সবকিছুই নিরর্থক হতে পারে, এ কথাও ভুলে যাইনি বা যাব না।

আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে অনেক ব্যথাই আমি পেয়েছি। সেজন্য রঙিন স্বপ্নের সাথে অনেক দুঃস্বপ্নও দেখতে শিখেছি– সে চেষ্টা সার্থকই হোক আর নিরর্থকই হোক। আরও চাইবো আপনাদের দুজনের মাঝে গভীর এবং নিখুঁত সম্পর্ক থাকুক।

আপনি যতটুকু লিখেছেন, তাতেই বুঝতে পেরেছি আপনার মনের অবস্থা। প্রথমেই অনুরোধ করবো একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করবেন না। আপনি কুড়িয়ে পাওয়া ফুলের মতো একজন হতে চান। আমি তা কখনোই হতে দেবো না, আমি ভাববো তার অতীত কাহিনী। সত্যি বলতে কী, আমি কিন্তু দুঃখীদের বেশি ভক্ত বা তাদের ভালো লাগে। তাই তাদের সাথে চলতে বেশি আগ্রহী। আপনি আমার তেমনই একজন ভাই, তাই আমার মনে হয় আপনার সাথে আমার এ সম্পর্কটা আজীবন থাকবে। আমাদের এই সমাজ, আভিজাত্য সবকিছুরই ঊর্ধ্বে থাকবে আমাদের ভাই-বোনের সম্পর্ক।

আমি তো আপনাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই জানি এবং বেশ কিছুদিন ধরে আপনার মনে যে একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাও জানি। আমি যে জানি তার বড় প্রমাণ আমার ঐ চিঠি। আমি তো আগেই বলেছি দোষ কামালের নয়, দোষ আমাদের নিয়তির। আমাদের মতো মানুষের এটাই তো সান্ত্বনা।

আপনি কামাল সম্পর্কে যা বলেছেন সবই সত্য কিন্তু এটা তো তার স্বভাব। আর সেজন্যই আমি তাকে দোষ দিইনে। দোষ দিতাম যদি সে এক একজনের কাছে এক একরকম হতো। সে তো সব ক্ষেত্রেই এক। আপনার চিঠি পেয়ে বরং দুঃখিত হয়েছি আপনার দুঃখে। সেই সাথে আরও দুঃখ পেয়েছি কামাল তার এমন একজন বন্ধুকে হারাচ্ছে এই দুঃসংবাদে। বিষয়টা এই পর্যায়ে যেতে পারে আমি তা কোনোদিনই ভাবিনি। আপনি যদি আপনার এই সিদ্ধান্ত না পাল্টান, তবে এটা নিঃসন্দেহে আমারই দুর্ভাগ্য মনে করবো।

আপনার চিঠি পেয়ে ঐ দিনই কামালের রুমে গিয়েছিলাম। আপনার চিঠি পড়িয়েছি– অন্যায় হলে ক্ষমা করবেন। কামাল এখন সুস্থ এবং ভালো আছে। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমার মনে হয় সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি পথের পথিক নন, আমাদের উভয়েরই চলার পথের

সাথী। আমি আমাদের সেই ফেলে আসা শুভ দিনের মতোই নতুন দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম। আমি যেন আপনাদের তেমনিভাবেই পাই এবং অবশ্যই পাব সেই আশা রাখি। সবশেষে অনুরোধ, ছোট বোনের ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন। আপনার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায়–

'ছোট বোন রুনী'

১২.

তারপর দুদিন কেটে গেল। কোথাও যাব না ভাবছি, তবু বাড়ির সবাই ধরাধরি করে বড়বোনের বাড়িতে বেড়াতে পাঠালো। এখানে সবাই পরিচিত। ছোটবেলা থেকে এখানে আসা-যাওয়া, থাকা। বাল্যকালে এখানে থেকে পড়াশোনা করেছি। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীতে সাঁতরেছি। নদীর পাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা, কোনোটা বা বেঁকে নদীর পানির মধ্যে গিয়ে বেঁয়ে ওঠা হিজলগাছ; সে গাছে চড়েছি, গাছ থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। সে এক আনন্দ! বাল্যস্মৃতি। জীবনের অসংখ্য স্মৃতি এখানটা ঘিরে। চারদিকে সহপাঠীর ছড়াছড়ি। আমার আসার কথা শুনলেই আসর জমে ওঠে।

ঘটনাক্রমে এক বিপদে পড়া গেল। পাশের বাড়িতে এক মেয়ের বিয়ে। ধরে বসলো সবাই, অবশ্যই যেতে হবে। কাগজের ফুল কাটা, গেট সাজানো, লাল-সবুজ-হলুদ কাপড়ের উপরে আর্ট করে লিখতে হবে। সমস্ত দায়িত্ব যে আমাকেই নিতে হবে! না গিয়ে উপায় রইল না। আজ কামালের সাথে মনকষাকষিতে সবকিছুই যেন ভুলে বসেছি। সবকিছুতেই বিতৃষ্ণা বোধ করছি। তবু অগত্য অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো।

একটা লাল কাপড়ের উপর লিখে জরি বসাচ্ছি। উড়ন্ত প্রজাপতির আকারে লিখেছি 'শুভবিবাহ'। মনের মাঝে কল্পনার জাল বুনছি, একেবারে অন্য জগতে চলে গেছি। মনে হচ্ছে, এ যেন অন্য কারো বিয়ে নয়, রুনীর বিয়ে। আমি এসেছি, সবকিছু নিজ হাতে করছি। একটু পরে বর আসবে, সে হবে কামাল। আমি কামালের অপেক্ষা করছি। সমস্ত 'শুভবিবাহ'-জুড়ে কামালের ছবি ভাসছে। তাই মনের মত করেই আঁকছি, জরি বসাচ্ছি। জানি

না কখন লেখা থেমে গেছে। ঐ দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। হয়তো অনেকক্ষণ কেটে গেছে। উপস্থিত সবাই হয়তো ভাবছে, আমি লেখা নিয়েই কিছু একটা ভাবছি– কী করা যায়!

একজন বলে উঠলো– কী ভাইয়া, লিখছেন না?

আমি সম্বিত ফিরে পেলাম, বললাম– হ্যাঁ লিখছি, একটু ভাবছিলাম আর কি?

আমার মনের মাঝে যে কোন ছবি উঁকি দিচ্ছিল তা হয়তো কেউই বোঝেনি। হয়তো কেউ কোনোদিন বুঝবেও না, সে এক বিধাতাই ভালো জানেন। ভাবছিলাম কামাল আজ কতদূরে! এমন সময় কামাল যদি পাশে থাকতো, কতই না আনন্দ হতো! আমার হাতের অনেক আর্টই কামাল দেখেছে। অনেক প্রশংসা করেছে, হেসেছে, রসিকতা করেছে। বলেছে– আর্ট দেখে কবে দেখো জোড়া মিলে যাবে। আমি হেসে বলেছি, সে আশায়ই তো আছি। কিন্তু সে আজ অনেক দূরে। খাঁচার পাখি বাঁধন কেটে চলে গেলে কি আর ফিরে আসে! হয়তো আর ফিরে আসবে না, সে তো নিরাশায় ঢাকা একফালি দুরাশার চাঁদ। সাথীহারা এ ভবঘুরে জীবনে কে সাথী হতে আসবে, বলো?

ভাবছি কামালের চিন্তাভাবনাকে, মনোভাবকে এতো খারাপ ভেবেও কেন জানি তার প্রতি বিতৃষ্ণা আসে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, তাকে নিয়ে আর ভাববো না। চলে যাব আবার অন্য কোনোখানে, অন্য জনপথে– কিন্তু না, যেদিকেই তাকাই ঐ কামালের মুখচ্ছবি। আর তার পাশে এসে ভর করেছে ঐ রুনী। মাঝে মধ্যে নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মে, খারাপ লাগে, নিজের কাছে নিজেকে অপমানিত বোধ করি, তবু তা ফিরে ফিরে আসে।

একটা ছেলে এসে বললো– সুজন ভাই আছেন? দুজন ছেলে আপনাকে ডাকছে।

রুম থেকে বেরিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছি– হয়তো ওপাড়া থেকে খেলা করার জন্য কেউ এসেছে। এই অসময়ে কি আর খেলা করা যাবে? বেলা তো আর বেশি নেই।

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়েই দেখি সামনে কামাল দাঁড়িয়ে, পাশে বাল্যবন্ধু রমা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। মনে হচ্ছে, এ কি স্বপ্ন– না বাস্তব? কামালের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাটির দিকে নিলাম– দাঁড়িয়ে আছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। একটু পর কামালই নীরবতা ভাঙলো, বলে উঠলো– দাঁড়িয়েই থাকবে, না বাড়ির ভিতর নিয়ে যাবে?

আমি তেমনি নির্বাক হয়ে ধীর গতিতে বাড়ির ভিতর পদচালনা করেছি– ওরা দুজন আমাকে অনুসরণ করছে। রুমে নিয়ে বসালাম।

কামাল আমার গায়ে হাত দিয়ে বললো– শরীরটা এত খারাপ করে ফেলেছ, এত ভেঙে পড়লে কেন?

আমি কোনো কথার তেমন উত্তর দিলাম না।

রমা বললো– এতক্ষণে তোর সাক্ষাৎ পেলাম। কামাল ভাই এসেছে গতকাল রাতে। তোদের বাড়ি ও রাত কাটিয়েছে। তোকে না পেয়ে সকালে আমার বাড়িতে গিয়েছিল। ভাবলাম তোর সাথে কামাল ভাইয়ের দেখা এবার আর হলো না। কবে নাগাদ বাড়ি ফিরবি তাও অজানা। শেষে দুজনে স্থির করলাম যেখানে আছিস সেখানেই যাই, তাই এতদূর চলে আসা। তারপর বল, কেমন আছিস?

আমি উত্তর দিলাম– খুব ভালো আছি। কি দরকার ছিল কত কষ্ট করে এতদূর আসার?

কামাল কোনো কথাই বললো না। ইজি চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে যেন উদাসীন হয়ে আছে, কোন এক অজানার পানে চেয়ে।

হয়তো আজকে মরা গাঙে বান ডেকেছে, তাই তো স্রোতের এত টান।

আমি জানতাম না, আমার বিরহের পাখি এমন করে পাখা গুটাবে। তাহলে আমার এত মনোকষ্ট, এত আঘাত, এত কল্পনা সবই কি ভুল? এর কি কোনো মূল্য নেই? তবে আমাকে কেন এমন করে ধিকিধিকি জ্বালানো? এতে তোমার কী সুখ? কী আনন্দ? যাকে এত অবহেলায় দেখো, অবহেলায় হারাও, সে কি বিদায় নিলে আবার ফিরে আসবে?

ভাবছি, যেভাবে নীরবে চলে এসেছিলাম, আজ ওকেও নীরবে ফিরিয়ে দিই। বুঝুক আপনকে পর করার কী জ্বালা। মেকিগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাক– প্রকৃত সোনাটুকুই রয়ে যাক। তাহলে থাক, কামালকে আর মায়াডোরে বাঁধবো না। মনের অজান্তেই বিদায় দিই। নিজেকে এই বলে বোঝাবো– রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।

বিয়েবাড়ি থেকে ক্যাসেটে গান ভেসে আসছে 'নদী যদি বলে সাগরের কাছে আসবো না, মেঘ যদি বলে আকাশের বুকে ভাসবো না– তা কি হয়? তা কি হয়?' কী জানি কী চিন্তা করতে করতে ওর ঐ হাসিভরা মুখখানি বার বার ভেসে উঠতে লাগলো হৃদয়পটে। হৃদয়ের প্রতিটা পরতে পরতে ছুটে চললো ওরই স্মৃতি। আমার জন্য এতদূর এসেছে, হয়তো ও নিজেকে অনেক শুধরে নিয়ে অনেক আশা করে এখানে এসেছে। তার এই আসাকে কোনো ভাবেই ফিরিয়ে দিতে পারলাম না।

কামালকে বললাম– কেমন ছিলে? পায়ের আঘাতটা কেমন হয়েছে, দেখি? মনে পড়ে গেল দুর্ঘটনার সেই কথা। পাশে বসে সারারাত জাগার কথা।

বিদায় নিয়ে আবার ফিরে এলাম কপালের ফেরে।

দেখলাম, মানুষ যেখানে আছাড় খায়– সেখানকার মাটি ভর করেই সে আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। এ স্বভাব মানুষের চিরন্তন। আর আমি যে সে মাটি ভর করে মনের অজান্তে আবার কখন উঠে দাঁড়িয়েছি। ভুল করাতে অন্যায় নেই, অন্যায় হচ্ছে ভুল ধরা পড়ার পর তা স্বীকার করে না নেয়া এবং নিজেকে শুধরে না নেয়া।

রাতে শুয়ে কামাল আমাকে অনেক কথাই বললো। সবই শুনলাম। মনের মাঝে ভেসে আসছে সেই কর্মমুখর-ব্যস্তসমস্ত দিনগুলোর কথা– যখন বালক ছিলাম। বাতাস না বইলেও মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটেছি কাঠির মাথায় একটা ঘুড়িকে সম্বল করে নিয়ে। শুধু একটা ঘুড়িই আকাশে স্বাধীনভাবে উড়বে– আমি দেখবো– এই আমার সাধনা– এই আমার বাসনা। ঘুড়ির সুতো কেটে গেছে, ছুটেছি পিছু পিছু, এক মাঠ থেকে অন্য মাঠে। কত ধান ক্ষেত, কত সবুজ ঘাস পায়ে মাড়িয়ে উর্ধ্বশ্বাসে চলেছি, সেদিকে দৃষ্টি দিইনি– শুধু ঘুড়ি, আমার ঘুড়ি। ছিঁড়ে গেছে, তালি

দিয়েছি, আবার উড়িয়েছি। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ক্লান্তিতে, শ্রান্তিতে সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হয়ে এসেছে। এলিয়ে দিয়েছি সমস্ত দেহটাকে ঘুমের কোলে। তারপর ভোর না হতেই খেজুর পাড়ার ধুম। মাঠের একপেয়ে রাস্তা ধরে ছুটে চলেছি এ-মাঠে ও-মাঠে। কে সবার আগে যেতে পারে তারই পাল্লা, এ-গাছে ও-গাছে খুঁজে ফিরেছি পাকা খেজুর। গাছে উঠে-উঠে বুক কেটে রক্ত ঝরেছে– সেদিকে লক্ষ্য করিনি। একটা মিষ্টি খেজুর মুখে পুরেই সব ভুলেছি। তারপর একরাশ খেজুর পুটলিতে বেঁধে কত আনন্দেই না বাড়ি ফিরেছি! এই তো বিচিত্র জীবন– বিচিত্র মন– বিচিত্র তার মানুষ!

তারপর বয়সের তালে তালে যতি এসেছে চলার ছন্দে, এসেছে ধীরতা– থেমে গেছে চঞ্চলতা। একটা নতুন মুখ এসে ঘুড়িকে গ্রাস করেছে– উড়িয়েছি মনের আকাশে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আবার ছায়া-প্রতিম ঘুড়িটার সুতা কেটেছে। জীবন থেমে নেই। অন্যটাকে বেছে নিয়েছি। বিভিন্ন নব নব আশাকে অবলম্বন করে উর্ধ্বশ্বাসে সামনে আমৃত্যু ছোটার নেশায় মেতেছি। চলেছি– কোন সে দূরান্তর!

পরের দিন কামাল বিদায় নিল। স্টেশন পর্যন্ত বিদায় দিতে এলাম আমি ও রমা। একটা চলন্ত ট্রেন এসে থেমে থাকা মুখটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম ট্রেনটাকে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে বুকের সম্বল করে নিয়ে আমি ও রমা বাড়ি ফিরলাম। যাবার সময় কামাল বললো– ভার্সিটি হয়ে দু-এক দিনের মধ্যে চিটাগং বেড়াতে যাব। যেখানেই থাকি তোমাকে অবশ্যই লিখবো।

১৩.

শুরু হলো চিঠির প্রত্যাশা। একদিন দুদিন এমনই করেই দিন চলেছে, কেটেছে মাস। কোনো খবর পাইনি। ঠিকানাও জানিনে যে লিখবো। মনের স্রোতে আবার ভাটা পড়লো। ভাবলাম, আমাকে মজিয়ে কামাল কি নিজেই বিদায় নিল? মানুষ এমনও হতে পারে?

তারপর একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ছোট্ট চিঠি। খামের বাম পাশে লেখা

'কামাল'। প্রত্যাশার সীমা তখন পেরিয়ে শুষ্ক মরুতে ঠেকেছে। কামাল চিঠি দিতে পারে এ কথা তখন আর ভাবিনে– তবুও এসেছে। চিঠিটা খুলে পড়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি– চাইনি তো জানতে সে কেমন আছে। তাই খামটা না খুলেই টেবিলের উপর রেখে দিয়েছি।

দুদিন কেটে গেছে। কোনো এক অলস মুহূর্তে চিঠিটা হাতে তুলে নিয়েছি। লেখা আছে–

প্রিয় সুজন,
ভালোবাসা নিও। আজ কদিন হলো চিটাগং থেকে ভার্সিটিতে পৌঁছেছি। অনেক দিন হলো তোমার কোনো সংবাদ নিতে পারিনি– কেমন আছো জানাবে। আমি ওখানে বেশ ভালোই ছিলাম। সাক্ষাতে সব বলবো।

'কামাল'

সংসারের নৌকা তো ভেসেই চলেছে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে। আমি তার মাঝি। হাল ধরে বসে আছি, নইলে যে ডুবে যায়। কামালের চিঠি পেয়েছি সেও একমাস কাটতে চললো। ভাবলাম, দেখি একবার ভার্সিটি থেকে ঘুরে আসি। কামাল ও রুনীকে দেখে আসি ওরা কেমন আছে। তাছাড়া রেজাল্ট আর কতদিনে বেরুবে তাও তো জানা দরকার। এর মাঝে রুনী বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছে। কামালও একটা দিয়েছে। সবগুলোরই উত্তর দিয়েছি।

একদিন ট্রেনে চাপলাম ভার্সিটির উদ্দেশ্যে। কামাল ও রুনীকে পেলাম। দিন কেটে যাচ্ছে।

আজ রোববার। বিকেলে আমি আর কামাল ট্রেন লাইনের ধারে বেড়াতে গেলাম। লাইনের দুধার দিয়ে চিকন সরু একপেয়ে পথ, তারই দুপাশ ঘিরে বন। ভাট, আশ্যাওড়া, আরও কত ছোট ছোট নাম-না-জানা গাছ। তাদের মাথায় মাথায় ছেয়ে গেছে বনলতা। বনলতার ফাঁকে ফাঁকে ভাট গাছের ফুল উঁকি দিচ্ছে। একটু ভাবলেই নিজের মনকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। বেশ কয়েকটা বছর ধরে দেখছি– প্রায়শ আসি– তবু দেখে সাধ মেটে না। বুনোলতাগুলো আস্তে আস্তে থরে থরে একেবারে মাটির সাথে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা– তাতে দুব্বা ঘাসে ছেয়ে আছে। প্রিয়জনের সাথে, একান্ত আপনজনের সাথে মনের কথা বলার এই তো

নির্জন জায়গা। কয়েকটা বুলবুল পাখি একবার এ-লতাটার মাথায়, আবার উড়ে অন্য লতাটার মাথায়– এভাবে উড়ে ফিরছে, আর ছোট ছোট করে কী যেন রব করছে। যেন ভাটফুলের সাথে ওদের মনের কথা বলছে।

বার বার নিজেকে হারিয়ে আবার খুঁজতে মনে চায়। মনে হয় যেন ছোটবেলার খেলার সাথীরে– একান্ত আপনজনকে এখানেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছি। হারানো সাথীকে লতার ফাঁকে ফাঁকে, এ-বন থেকে অন্য বনে খুঁজে খুঁজে ফিরি– লুকোচুরি খেলায় মাতি। তবুও যেন মনের আশ মেটে না। খুঁজে আবার হারাই– হারিয়ে খুঁজি। খুঁজে খুঁজে শ্রান্ত হয়ে লতার কোলেই এলিয়ে পড়ি। বার বার মনের একান্ত সুর মুখে এসে মিলছে। তাই গুন গুন সুরে গেয়ে চলেছি– 'খুঁজে মরি এইক্ষণে, স্মৃতির গহনে, কোথায় তোমায় যেন দেখেছি।'

কোথায় যেন লতার ফাঁকে স্মৃতির হাসি শুনতে পাচ্ছি– আবার হারিয়ে ফেলছি– আবার খুঁজছি। এই তো মন, এই তো অনুভূতি– এখানেই কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলে– গড়ে তোলে কাব্য।

দুজনে রেল-লাইনের উপরে বসে আছি। রুনীকে নিয়ে অনেক গল্প করছি। একসময় কামাল আমাকে বললো– জানো সুজন, আজ তোমাকে একটা কথা বলবো।

– কী কথা বলবে, বলো? আমি বললাম।

– যতই দিন যাচ্ছে, রুনীকে যেন ততই ভালোবেসে ফেলছি; কিন্তু কেন জানি মনে হয়, জীবনের মাঝে ওকে পেয়ে আমি ধন্য হতে পারবো না, আমার আশা পরিপূর্ণ হবে না। ও বেশ আবেগ ভরেই কথাগুলো বললো।

বললাম– কী বলতে চাও তুমি? পরিষ্কার করে বলো।

ও বললো– ভার্সিটি জীবনের তো প্রায় সমাপ্তি। ভার্সিটির প্রেম ভার্সিটিতেই রেখে যেতে চাই। রুনীর থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

বললাম– এ সব কী বলছো তুমি? তাও কি সম্ভব? সে যে তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তোমাকে না পেলে যে সে জীবনে বাঁচবে না– জনম দুঃখী হয়ে যাবে। তবে এতদিন তার সাথে অভিনয় করলে কেন?

আগে কি ভেবে দেখা উচিত ছিল না? যদি এখন তাকে গ্রহণ করবে না, তবে কেন গ্রহণ করেছিলে তার ভালোবাসা? কেন তার আশা-জাগানিয়া গান শুনিয়েছিলে? কেন তাকে এ আগুনে পোড়ালে? যে না-ফোটা ফুলকে তুমি আজ ছিঁড়লে, ভেবে দেখেছো কি তার ভবিষ্যৎ?

– তা হোক সুজন, আমি অনেক ভেবেছি। বিদায় যে আমাকে নিতেই হবে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে। কামালের কণ্ঠে দৃঢ়তামিশ্রিত মিনতির সুর।

বললাম– হয়েছে কি তোমার?

– সে যে এক ইতিহাস, তোমার না-জানা কাহিনী, এই অধ্যায়ের প্রথম পাঠ। আর তাই তো রুনীর এত দুর্বলতা। সবই তোমাকে বলবো একদিন, সে যে অনেক কথা। কামাল অনেকগুলো কথা একসাথে বলে একটু থামলো।

আমি গলার স্বরটাকে একটু বাড়িয়ে বললাম– রুনীর পরিণতি কী হবে জানিনে, তবে এটুকু বলতে পারি, এমন দিন একদিন আসবে যখন শত চেষ্টা করেও তুমি রুনীকে আর পাবে না। সে তখন তোমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। আর সারাটা জীবন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে– এ কথা ভুলে যেও না। কিন্তু তখন তুমি এই দিন আর ফিরে পাবে না। ফিরে পাবে না রুনীকে– পাবে না আমাকে– মনে পড়বে বার বার আমার এই কথা কয়টা।

দুজনে রুমে ফিরে এলাম। কামালের কথা আজ আমাকে বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু ভাবছি, আগে যদি জানতে তাকে আপন করে নেবে না, তবে কেন তাকে আশা দিয়েছিলে? কেন তার ছায়া মাড়াতে গেলে? এমনই করে আমাদের মনের অজান্তে কত ফুলই না না-ফুটে ঝরে পড়ছে– কে তার খবর রাখে! কামাল এত নিষ্ঠুর! দয়ামায়া কি ওর জীবনে একেবারেই নেই?

কামাল কথা বলে নীরবতা ভাঙলো, বললো– আচ্ছা সুজন, তুমি কেমন করে কবিতা লেখো, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না?

বললাম– কবিতা লেখা? সে সময় তোমার এখনও আসেনি। হয়তো একদিন আসবে। তখন আর শিখিয়ে দিতে হবে না, আপনিতেই পারবে। আজকে যখন শিখতে এসেছো তখন আমি বলি তুমি লিখে যাও– মনে করো

তুমিই লিখছো। আমি বলে চলেছি, কামাল কলম ধরেছে–

এক চোখে আছে আমার বিশ্বাস, আরেক চোখে আছে সন্দেহের ছায়া,
এক মনে আছে পূর্ণ বিচ্ছেদ, আরেক মনে মায়া।
এক কানে শুনি তোমার বাণী আবার বলিও– হ্যাঁ,
একবার বলি তোমায় রাণী, আরেকবারে– না।

কামাল বললো– আরে, এ যে আমার মনের কথা, তুমি জানলে কী করে?

– আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। শোনো কামাল, আমার কথা শোনো। একটা পথকে দুভাগ করে দিও না, তাতে নিজেও জীবনে শান্তি পাবে না, আর অন্যকে ধিকিধিকি জ্বালাবে।

রাতে শুয়ে আছি। ভাবলাম রুনীকে সব কিছুই খুলে বলবো। কামালের মিথ্যা প্রতারণার কথা বলবো। জগতে কেউ কারো নয়– এ কথাই বলবো। তার সব আশা, সব প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ; সে যে এতদিন একটা বালির বাঁধ গড়েছে– সবকিছু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবো। আমি যে তাকে বোন বলে স্বীকার করে নিয়েছি। ভাই কি কখনো কোনো বোনের অমঙ্গল কামনা করতে পারে? আমি যে রুনীর আশার আলো, আমাকে দিয়েই তো রুনী কামালকে জয় করতে চেয়েছে। সে যতই গোপন করুক না কেন– এতটুকু তো আমি বুঝি। সবই বলতে হবে।

কিন্তু শুনেছি প্রেমে পড়লে মানুষ নাকি অন্ধ হয়ে যায়, ভালোমন্দ বিচার করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাহলে রুনী যদি আমার কথার সঠিক অর্থ না বোঝে, আমাকে যদি অবিশ্বাস করে, যদি ভুল বোঝে– তখন কী হবে? রুনী তখন আমার কথা কুৎসিত মনের বিকার বলেই জানবে।

এদিকে কামাল? কামাল আমাকে বিশ্বাস করেই কথাটা বলেছে। কামালের কাছে বিশ্বাসঘাতকরূপেই চিহ্নিত হবো। তাছাড়া আমিও যে কামালের অকল্যাণ চাই না– কামাল কি এক্ষেত্রে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করবে না?

তার চেয়ে রুনীকে জানাবো না। যতদিন পারি, যেভাবে পারি কামালকে বোঝাবো, তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবো। কামালের মনের মাঝে

রুনীকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো। ওদের দুটো জীবনকে একই স্রোতধারায় আনার চেষ্টা করবো। কিন্তু যদি না পারি, তবে তো রুনী আমাকে ভণ্ড হিসেবেই জানবে। বলবে, আমি কামালের মনোভাব জেনেও তাকে যথাসময়ে জানাইনি। আমিও তো নিজের মনের কাছে দগ্ধ হবো। আর যদি কামালকে বুঝিয়ে দুজনকে এক করে দিতেও পারি, তবুও তো রুনী জানবে না আমার প্রচেষ্টার কথা।

আবার ভাবি, কাজ নেই রুনীর আমাকে ভালো জেনে। তার অজান্তে তার কল্যাণ করা, স্নেহ করা, তার মঙ্গলে কাজ করে যাওয়া– এই তো বড় ভাইয়ের দায়িত্ব। আমার সব কথা রুনীকে বলাই উচিত। তারপরও যদি রুনী আমাকে ভুল বোঝে বুঝুক। আমার সম্বন্ধে তার ভুল ভাঙিয়ে কাজ নেই। প্রাকৃতিক নিয়মে সে সত্যিই একদিন বুঝবে, আমি তাকে সঠিক তথ্যটা সময়মতো দিয়েছি– আমি তাকে সত্যিই স্নেহ করি। সেদিন হয়তো পথে পাওয়া এ ভাইকে প্রকৃত ভাই হিসেবে বুঝবে। বুঝবে, সব পথই অসীমে যায় না, অনেক পথ আছে যা ঘুরে ঘুরে আসে।

রাত বেশ হয়ে গেছে। একটা ছেলে এসে আমাকে বাইরে ডেকে এনে বললো– সুজন ভাই, আগামীকাল রুনী আপনাকে অবশ্যই সাড়ে চারটার দিকে দেখা করতে বলেছে হলের গেটে। সকালে ওর ক্লাস আছে।

কিছুক্ষণ পর কামাল বললো– কাল বিকেল চারটায় কেন্দ্রীয় রেস্তোরাঁয় মিটিং রয়েছে। তোমাকে একটু যেতে হবে। অন্তত আমার দিকে তাকিয়েও তোমার যেতে হবে, মিটিংয়ে গোলযোগ হতে পারে।

পরের দিন। বিকেল চারটার আগেই আমি, কামাল আর মাসুদ ভাই মিটিংয়ের দিকে চলেছি। ভাবছি, রুনীর সঙ্গে তাহলে আজ আর দেখা করা হলো না। ও হয়তো সময়মতো গেটে এসে অপেক্ষা করবে। তারপর একসময় নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে রুমে। আগামীকাল হয়তো দেখা করা যাবে।

মিটিং চলছে। প্রায় শেষ পর্যায়ে। গোলযোগ যেন হলো না। আমি আর মাসুদ ভাই আশপাশে ঘোরাঘুরি করছি। মিটিং থেকে নিজেদের দূরে রেখেছি। পাশে কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অভিষেক অনুষ্ঠান চলছে। বিচিত্রানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। একটা গান সবেমাত্র শেষ

হলো– আরেকটা আরম্ভ হয়েছে। আমি আর মাসুদ ভাই পায়ে পায়ে সেদিকে গেলাম।

গানের সমাপ্তিতে শব্দের নীরবতা। বাইরে থেকে শোরগোলের সুর কানে ভেসে আসছে। দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। রিভলবারের গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখি মারামারি আরম্ভ হয়ে গেছে। সবার হাতে হকিস্টিক আর রড। মুখে মার মার শব্দ। সামনে শুধু বিরোধীদলের ছেলেগুলোকেই দেখতে পেলাম। তাহলে কামাল ধরা পড়ে গেছে– মাসুদ ভাইকে বললাম। উনি আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন। হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলে আমাকে বাঁধা দিয়ে বললেন– না, ওর ভিতরে যাবেন না। ওরা সবাই আপনাকে চেনে, শেষে মারা পড়ে যাবেন।

আমি কোনো কথা কানে নিলাম না। হাতখানা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সেদিকে ছুটলাম। মাসুদ ভাই পিছন থেকে কয়েকবার ডেকেছিলেন, কিছু শুনিনি।

ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়লাম। বিপক্ষ দলের অনেককেই আমার দিকে তাকাতে দেখলাম। কোনোকিছু আমলে নিলাম না। শুধু কামালকেই খুঁজে ফিরছি। চারদিকে শুধু হকিস্টিকের দাপট চলছে। কারো কারো হাতে কিরিচ। মাঝে মাঝে চলছে গুলির শব্দ। তার সাথে চলছে বিকট চিৎকার আর করুণ আর্তনাদ। আমি খুঁজছি কামালকে। ওদিকে একদল ছেলে কোনো একজনকে ধরে আনছে– শব্দ হচ্ছে 'ধরেছি শালাকে', 'মার শালাকে'। হয়তো কামালই হবে– ছুটে গেলাম সেখানে। একেবারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। দেখি, না কামাল নয়– ওদেরই দলের একজন। স্থির সিদ্ধান্তে এলাম, কামাল হয়তো বিপদমুক্ত স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। মনে হলো, শিক্ষাঙ্গনে মুক্তচিন্তার কোনো স্থান নেই, সহনশীলতা নেই, সেখানে চলছে অস্ত্রের ঝনঝনানি, রক্তের বন্যা, স্বার্থের খেলা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দিয়েছে স্বাধীনতার গর্ব, পাশাপাশি মনে দিয়েছে জিঘাংসা। প্রতিপক্ষ বদল হয়েছে মাত্র। অনতিদূরের অডিটোরিয়ামে গানের সুর হঠাৎ থেমে গেছে, কে কোথায় দৌড়িয়ে পালিয়েছে জানিনে, কিন্তু সে সুর আমার কানে যেন এখনও ভেসে আসছে, "তুমি যে সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে, সে আগুন ছড়িয়ে গেল, সে আগুন ছড়িয়ে গেল, সবখানে– সবখানে– সব-খা-নে-এ।"

কামাল এবার কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তা খোঁজার পালা পড়লো। কয়েকটা হল খোঁজ করলাম, পেলাম না। তারপর এক হলে গিয়ে দেখি কামাল আছে, ওরা কয়েকজন মিলে বসে মিটিং জমিয়েছে– কী করা যায়?

রাতে সবাই ওরা গা ঢাকা দিল, না জানি কখন আক্রমণ করে বসে। আমি হলেই থাকলাম।

সকাল দশটা হবে বোধ হয়। একদল ছেলেকে হলে ঢুকতে দেখলাম। রুমে একাই আছি। হল ঘুরে দলটি রুমে এসে ঢুকলো– চোখে মুখে অনুসন্ধানের ছাপ। জিজ্ঞেস করলো– বলুন, কামাল কোথায়? উত্তর দিলাম– শহরে গেছে।

ওরা বললো– মিথ্যে কথা বলছেন, সত্য করে বলুন।

বললাম– তবে খুঁজে নিন।

– কামালের রক্ত দিয়ে আমাদের পিপাসা মিটাতে চাই। যেখানেই পালাক না কেন, ধরা একদিন দিতেই হবে। কথাগুলো বলতে বলতে ওরা চলে গেল।

ব্যাগের ভিতর কিছু জামাকাপড় পুরে নিয়ে বয়কে ডেকে স্টেশনে পাঠালাম। কামালকে আগেই বলা ছিল যথাসময়ে স্টেশনে আসতে। দুজনে গোপনে স্টেশনে এসে পৌঁছুলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল- দুজনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এ পর্বের এখানেই সমাপ্তি। কামাল তার নিজের বাড়িতে গেল, আমিও ফিরে এলাম। রুনীর সাথে আর দেখা করা হলো না।

বাড়ি এসেছি প্রায় পনেরো দিন হতে চললো। এ পর্যন্ত কামালের কোনো খোঁজ নেই। একটা চিঠি দিয়েছিলাম– আমাকে না জানিয়ে যেন ভার্সিটিতে না যায়।

১৪.

বিকেল হতে চলেছে। বাল্যবন্ধু রমা এলো, বললো– সুজন, কেমন আছিস?

– ভালো নয়, মনের অবস্থা খুব খারাপ।

– কেন, কী হলো? ও পাল্টা প্রশ্ন করলো।

– পরীক্ষার রেজাল্টের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে, আমার মনের অবস্থা ততই খারাপ হতে চলেছে। আরো বললাম– রাতে স্বপ্নে দেখেছি আমি পরীক্ষায় ফেল করেছি, তাছাড়া বেশ কিছুদিন হতে চললো কামালের কোনো খরব নেই।

ও বললো– ওসব কিছু না, মন খারাপ করিসনে। চল, নদীর ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।

বললাম– কতদিন যে নদীর ধারে যাইনি, মনেই পড়ে না। নদীতে তো স্রোত আর চলে না, দামে ছেয়ে গেছে, তাই না?

ও বললো– হুঁ।

– আচ্ছা, নদীর ধারে সে দেবদারু, শিমুল, হিজল, ঝোপঝাড় সবকিছুই আছে তো? আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম।

ও বললো– সবই আছে, চল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।

দুজনে নদীর ধারে বসে আছি। নদী মরে-মরে অবস্থা। দুপাশ থেকে চাষবাস ক্রমশ নদীতে নেমে আসছে। কোথাও কোথাও পাশ দিয়ে ঝোপ-ঝাড়, বন, আগাছায় ছেয়ে গেছে। কোথাও বা বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দামমুক্ত কালো-নিথর পানি। বিগত দিনের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছে। কতদিন দুজনে এই নদীর ধারে বসে গল্প করেছি। তারপর অনেক দিনের বিরতি, আজ আবার কী মনে করে এসেছি। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে গল্প করলাম। তারপর দুজনেই চুপচাপ বসে আছি। কোন ভাবের উদয় হয়েছে জানিনে, মনে হচ্ছে যেন কবিতা লিখি–

বসে বসে নদীর তীরে দেখছি কত শোভা,
পুরনো গাঁয়ের দখিন হতে নেমে আসছে আভা।
গাছপালার ছায়া, কুটীর প্রভৃতি আরো কত দৃশ্য নয়নরঞ্জন,
দুধার বরাবর চলেছে সারি সারি শিমুল, হিজল বন।
কোথাও তটভূমি, সবুজ ঘাস চারদিকে পড়েছে ঝুঁকি
সূর্য কিরণ ছায়ার মাঝে মারছে উঁকিঝুঁকি।

নৌকা একটা বাঁধা আছে তীরে শিমুল গাছের সাথে
আঁকাবাঁকা হয়ে বুনো লতারা উঠেছে গাছের মাথে।
গাঁ হতে পদচিহ্নের পথ এসেছে নদীর সনে,
কলসী কাঁখে গ্রামের মেয়েরা আসছে ক্ষণে ক্ষণে।
অচেনা জেলেরা ডিঙি নৌকা আর বৈঠা নিয়ে হাতে,
ধরছে মাছ ঘুরে ঘুরে তারা হাঁড়ি বাঁধা লাঠির সাথে।
নদী যেন দুকূল হতে গেঁথেছে কুসুমদাম,
গাঁয়ের রাখাল বাজায় বাঁশি অচেনা তার নাম।

বাঁশিটা বনের ওপার থেকেই যেন ভেসে আসছে– একটা অতি পরিচিত গানের সুর বাজিয়ে চলেছে, 'নদীর এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা।' আমি ভাবছি, আমার জীবননদী তো শুধু ভেঙেই গেল, আমার আর ঠাঁই কোথায়? কোনো দিকেই তো আর চর জাগলো না।

রমা আমাকে একটা গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো। বললো– অনেক দিন তোর গান শুনিনি।

বললাম– আমার গান? সে তো গান হবে না, সে হবে জীবন কাহিনী। এ কাহিনী কেউ কি শুনতে চাইবে? আমার এ গানে যে ব্যথা এসে সুরের লহরী তুলবে, সে সুর কারো পছন্দ নাও হতে পারে। তার চেয়ে আমার গানকে আজ ছন্দে রূপ দিয়ে যাই। যদি বলি–

আমার সুর পাখির নীড়ে
আমার গান কনকচাঁপার বনে,
আমার সুর নদীর তীরে
আমার গান দোয়েল শ্যামার তানে।
আমার সুর বাঁশের বাঁশি
আমার গান মাঘ-ফাল্গুন মাসে,
আমার সুর অহর্নিশি
আমার গান নদীর স্রোতে ভাসে।

আমার গান সবুজ মাঠে–
আমার সুর পল্লী চাষীর কানে,
আমার গান পথেঘাটে
আমার সুর মাঠের পাকা ধানে।
আমার গান পাখির মুখে
আমার সুর প্রাণ পাগল করে,
আমার গান সুখে ও দুঃখে
আমার সুর মরা নদীর ধারে।
আমার সুরে অশ্রু ঝরায়
আমার গান সকল দুঃখের সুখে,
আমার সুরে হাসি ফোটাই
আমার গান কৃষাণ বধূর মুখে।
আমার গানে হৃদয় মাতায়–
আমার সুর মাল্লা-মাঝির নায়ে,
আমার গানে প্রাণ কাঁদায়
আমার সুর সকল রাঙা পায়ে।

সন্ধ্যায় দুজনে বাড়ি ফিরলাম। তারপর বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে। বসে বসে শুধু দিন গুনছি। কী যে হলো? কামালেরও কোনো চিঠি পেলাম না। তাছাড়া রেজাল্ট তো এতদিনে বের হবার কথা। বিকেলে একটা চিঠি পেলাম– জানিনে এ চিঠিতে আমার জীবনের মোড় কোন দিকে নেবে। অনেক আশা নিয়ে চিঠিটা খুললাম। বকুল লিখেছে। খুলে পড়তেই চোখ স্থির হয়ে গেল, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। এও কি সম্ভব? সমস্ত পৃথিবীটা ভেঙে যেন আমার মাথার উপর পড়লো। নিজেকে আর স্থির রেখে বসে থাকতে পারলাম না। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শুধু ভাবছি, আমার কী হবে? স্বপ্নে যা দেখলাম তাই সত্য হলো– তাই হলো বাস্তব। এতদিনের এত আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ভেঙে-চুরে চুরমার হয়ে গেল। এ মুখে যে এতদিন পর কালি পড়ে গেল– মুখপোড়া হয়ে গেলাম। জীবনটা এখন

যেন একপাত ঝলসানো লোহা, এর পরিণতি যে এখন কোনদিকে যাবে কে জানে! একে একে সবাই জেনে ফেললো আমার রেজাল্টের কথা। সবাই বুঝ দিতে লাগলো। কিন্তু সাপে যাকে কেটেছে, সেই জানে বিষের কী জ্বালা। কী ভাবছি নিজেই জানিনে, ভাবছি অতীতকে– কামালের কথা, পরীক্ষা হলের কথা, যাযাবর জীবনের কথা। সবই স্মৃতিপটে ভেসে আসছে।

তিন দিন পর কামালের চিঠি পেলাম। সে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে পাস করেছে। আমাকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে– জীবনের সব চাওয়াই পাওয়া যায় না। সবই খোদার হাতে, তার ইচ্ছায় নিজেকে খুশি রাখতে হয়। তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। আবার ভবিষ্যৎ রচনা করতে হবে। জয়ের মধ্য দিয়েই পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে ফেলতে হবে। আমি ভার্সিটিতে আগামী পরশু যাচ্ছি। ভর্তি হতে হবে, তাছাড়া আমাদের ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি আরম্ভ হতে যাচ্ছে। পারলে তুমি চলে এসো। ভর্তি হয়ে আবার পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করো।

চিঠি পড়ে শুধু এই বাস্তবতাটুকুই মনে ভেসে উঠলো– পৃথিবী হু-হু গতিতে সামনের দিকে ছুটে চলেছে– এ গতিতে কেউ থেমে নেই। চলার পথের প্রতিযোগিতায় পড়ে যার পা ভাঙলো, শুধু সেই পড়ে রইলো।

তবু ক্ষণিকের জন্য যত দুঃখই পাই না কেন আমি আনন্দিত, আমি গর্বিত। ভাবছি, কামালের সাথে দেখা হলে ভালো হতো। কতোদিন তাকে দেখিনি। কামাল পাস করেছে, ডিভিশন পেয়েছে, আমার আশা সফল হয়েছে– এই তো আমার পাওয়া।

বাড়িতে সবাই ধরে বসলো আবার ভর্তি হতে হবে, পড়তে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে, ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

ফুল ছিঁড়তে গেলে কাটার আঘাত তো সইতেই হবে, নইলে সে ফুল পাওয়ার সার্থকতা কোথায়? যা পাওয়া যত কঠিন, তা প্রাপ্তিতে তত আনন্দ। জীবনে ব্যর্থতা না থাকলে তো চারিদিকে শুধু আনন্দেরই ধ্বনি শোনা যেত। সে ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে বাজতো– তার মূল্যায়ন হতো অনেক কঠিন। চাঁদ দেখে মানুষের আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল তা জানতে। বিধাতা দিয়েছিল শক্তি,

কবি দিয়েছিল কল্পনা, বিজ্ঞান দিয়েছিল পাখা। তাই প্রচেষ্টার পরাগে ভর করে একদিন মানুষ পৌঁছেছিল চাঁদে।

মনে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে, বুকে নতুন করে বল বেঁধে আবার কল্পনার জগৎকে সাজাতে লাগলাম। ভাবছি, নিজে দুঃখ পেলে চলবে না। আমার এ অকৃতকার্যতা– এ তো অনেক আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল– তা যখন হয়নি, তখন আর ভেবে লাভ কী? ফল তো আমাকেই ভোগ করতে হবে। এ যে বন্ধুত্বের প্রতিদান। এ তো আমাকেই গ্রহণ করতে হবে।

১৫.

বেশ কদিন কেটে গেল। সংসার নৌকা মাঝনদীতে রেখেই আবার চললাম অনিশ্চিতের পানে, ভবিষ্যতের আশায়– ভর্তির আশায়। মনে অনেক স্বপ্ন– গিয়ে কামালকে পাব, রুনীকে পাব, আরো অনেক বন্ধুকে পাব, কতদিন পর আবার দেখা হবে। হয়তো ওরা আমাকে পেয়ে কতই না আনন্দিত হবে। বাড়ি থেকে বের হলাম। স্টেশনে পৌঁছেছি।

যথাসময়ে ট্রেনে উঠলাম। ভার্সিটিতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা লেগে গেল। রুমে এসে দেখি কামাল নেই, বাইরে গেছে। মাসুদ ভাই বললেন– দুপুরের পরই বাইরে বেরিয়েছে। কথাটা বলে একটু মুচকি হাসলেন। বুঝতে বাকি রইলো না যে, রুনীর সাথে কোথাও বসে গল্পে মত্ত। সন্ধ্যার বেশ পর সেলিমের সাথে কামাল রুমে ফিরলো। এক রুমে তিনটা বেড। দরজা দিয়ে ঢুকে রুমের শেষ প্রান্তে যে বেড, সেটাই কামালের। আমি কামালের বেডে শুয়ে একটা পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছি। রুমে এসে কামাল দরজার পাশেই সেলিমের বেডে বসলো। রুমে আরো দুজন ছিল, তাদেরকে নিয়ে গল্প করতে লাগলো। আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখলো বলে মনে হলো, কিছু বললো না। আমি পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে মাঝে মাঝে শুনছি তাদের কথাবার্তা, হাসাহাসি। বেশ কিছুক্ষণ পর মাসুদ ভাই বলে উঠলেন– এই যে কামাল ভাই, সাগর শুকিয়ে যে মরুভূমি হয়ে গেল। ওদিকে তাকিয়ে কি দেখেছেন, কে এসেছেন?

একটু পরে কামাল আমার পাশে চেয়ারে এসে বসলো, বললো– সুজন কখন এলে?

বললাম– এই তো সন্ধ্যায়।

– তারপর কেমন ছিলে? ও প্রশ্ন করলো।

– সে তো বুঝতেই পারছো।

তারপর কামাল জামাকাপড় পরিবর্তন করে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলাম– খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেমন চলছে?

– তিনজনে মিলে রান্না করে খাচ্ছি।

ডাইনিং রুম বন্ধ, হোটেল ছাড়া গত্যন্তর নেই, আমি হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

ঘণ্টা খানেক বাদে রুমে ফিরলাম। দেখি, কামাল আলতোভাবে শুয়ে বই পড়ছে। আমি চেয়ারটিতে বসলাম, জিজ্ঞেস করলাম– ভর্তি হয়েছো?

ও বললো– এখনও শেষ করতে পারিনি, একটু অসুবিধে আছে।

কামাল কী যেন একটু ভাবলো, তারপর উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে পড়ারত সেলিমকে ধাক্কা দিয়ে বললো– কী মশায়, খুব যে পড়াশোনায় ব্যস্ত? পরীক্ষা তো পিছিয়ে গেল, তবে এত ব্যস্ত কেন?

এ বলে দুজনে গল্পে বসলো।

কামাল যে আমাকে কিছুটা উপেক্ষার ছলে দেখছে এটা বোঝা গেল। তবুও কোনো কথা না বলে চুপ থাকলাম।

উত্তর ব্লকে আমার বেড শূন্য পড়ে আছে। কামালের রুমে আরো একজন অতিথি আছে একথা বলে, শেলফ থেকে মশারীটা নিয়ে আমার রুমে চলে এলাম। সারাদিনের ক্লান্তিতে অচিরেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম।

সকালে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেছে। নাস্তা করতে বাইরে যাব। যাবার পথে কামালের রুমে ঢু মারতে গেলাম। ওদের নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।

মাসুদ ভাই জিজ্ঞেস করলেন– সুজন ভাই, নাস্তা করেছেন?

বললাম– নাস্তা করতে বাইরে যাচ্ছি।

মাসুদ ভাই কিছুতেই ছেড়ে দিলেন না। শেষে ঐ রুমেই নাস্তা করতে হলো।

নাস্তা করে কামাল ডিপার্টমেন্টে ছুটলো। জিজ্ঞেস করায় বললো– ক্লাস আছে।

ভাবলাম– এই তো অদৃষ্টের পরিহাস।

রুমে এলাম। বেডে শুয়ে আকাশ পাতাল এক করছি। কিছুক্ষণ পর উঠে একাডেমিক বিল্ডিংয়ের দিকে পা বাড়ালাম। ভর্তির কাগজপত্র অফিসে দেখাতে হবে। তারপর ব্যাংকে টাকা জমা দেয়া।

দুপুরে ফেরার পথে কামালের রুম হয়ে ফিরছি। দেখি, মাসুদ ভাই আমার খাবারও রান্না করেছেন। সবাই মিলে খেলাম। কামাল আমাকে বললো– ভর্তি হতে পেরেছো?

বললাম– শুধু ব্যাংকে টাকা জমা বাকি। আগামী মঙ্গলবার ছাড়া ব্যাংক ভর্তির টাকা জমা নেবে না।

দুপুরে খেয়ে কামালের বেডেই একাকী শুয়ে আছি। কামাল সেলিমের বেডে গিয়ে শুলো। ওরা কী যেন বলাবলি করছে আর হাসছে। আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে রুমে যাওয়ার কথা বলে চলে এলাম।

ভাবছি কামালের কথা। কত আশা নিয়ে, কত ব্যথা বুকে ধরে এখানে এসেছি। ভেবেছিলাম গিয়ে কামালের দেখা পাব। অনেক দিনের জমে থাকা অনেক কথা বলে কিছুটা হালকা হব। তার সফলতার কথা ভেবে নিজের ব্যর্থতাটা কিছুটা হলেও লাঘব হবে। কিন্তু হলে এসেই মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেল। নিজের কাছে নিজে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হচ্ছে। তারপর আমাকে নিয়ে কামালের নির্লিপ্ততা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এছাড়া রুনীর সাথে দেখা করতে যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ততই ভালো।

মাসুদ ভাই রুমে ঢুকলেন, বললেন– সুজন ভাই, চলুন, নবীন বরণ দেখে আসি। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের নবীন বরণ হচ্ছে।

বললাম– শরীরটা ততটা ভালো নয়, তাই যেতে পারবো না।

– কামাল তো দেখলাম সেলিমকে সাথে নিয়ে বাইরে গেল। সম্ভবত নবীন বরণ দেখতে। কামাল আপনাকে যেতে বলেনি? মাসুদ ভাই বললেন।

– কই? না তো। আমি কিছু না-বোঝার মতো করে উত্তর দিলাম।

মাসুদ ভাই বললেন– সত্য বলেন তো একটা কথা বলি। কামাল যেন আপনাকে এড়িয়ে চলছে বলে মনে হচ্ছে। কী হয়েছে আপনাদের?

বললাম– কই, কিছুই না তো। হয়তো সময় পাচ্ছে না তাই এক সাথে বসে দু-পাঁচটা কথা বলা হচ্ছে না। তাছাড়া তো কিছুই হয়নি।

উনি বললেন– তবুও যেন কেমন মনে হচ্ছে।

আমি বললাম– চলুন, ছাদে উঠে দুজনে গল্প করি।

ছাদে দুজনে পাশাপাশি বসে গল্প করছি। উনি বললেন– রুনী সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন নাকি?

–কিছুই তো শুনিনি, কেন, কী হয়েছে?

– সেলিম ভাইয়ের সাথে কয়েক দিন আগে খুব গোলযোগ। সেলিম ভাই নাকি কামালকে ওভারট্রাম করে রুনীকে কী বলেছিল। কথা শুনতে একটু খারাপ– তাই নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

বললাম– এ কথা কি কামাল শুনেছে?

– নিশ্চয়ই। উনি উত্তর দিলেন।

আমার মনে কামাল সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিল। রুনীকে নিয়ে কামালের অনীহা কি তাহলে কামাল সেলিমকেও বলেছে নাকি? তবে এত কিছু জেনেও কামাল কেমন করে সেলিমের সাথে এত হাসাহাসি, এত মাখামাখি করছে? তাহলে কি কামাল আমাকে এসব বিষয়ে সন্দেহের চোখে দেখছে? আমার মনে সন্দেহের জটা পাকাতে শুরু করলো। আমার বার বার মনে হলো, 'ভবের নাট্যশালায়, মানুষ চেনা দায় রে, মানুষ চেনা দায়।'

এ সম্বন্ধে অবশ্য রুনীর চিঠিতে আমি বেশ কিছুটা আভাস আগেই

পেয়েছিলাম। রুনী লিখেছিল, 'সেলিম ভাইকে ভালো বলেই জানতাম কিন্তু তার যে ব্যবহার পেলাম, অবাক হলাম বিচিত্র পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের বৈচিত্র্যময় রুচি দেখে।' তাতেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। আমি তো ওকে আগেই নিষেধ করেছিলাম সবার সাথে এত আন্তরিকভাবে মিশতে। আমার আর কী বলার আছে? এর আগেও এমনই একটা ঘটনা হয়েছিল, যার ফলে আমি রুনীকে বকা দিয়েছিলাম। আবার একটা হলো, শিক্ষা পেলে এবার থেকেই পেয়ে যাবে। হয়তো এ নিয়ে অনেক কিছু করতে পারতাম, কিন্তু যাদের নিয়ে করবো তারাই তো তাদের।

মাসুদ ভাই বললেন– তবুও কামালের এটা ঠিক হচ্ছে না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন গল্পে কাটালাম। তারপর মাসুদ ভাইয়ের সাথে ওদের রুমে গেলাম। মাসুদ ভাই আর আমি বসে আছি। একটু পরেই কামাল আর সেলিম এলো। পোশাক পরিবর্তন করলো। হাত-মুখ ধুয়ে এসে অন্যদের নিয়ে গল্পে বসলো। গল্প চলছে নবীনবরণ নিয়ে– কে কী বললো, গানগুলো কেমন হলো ইত্যাদি। অনেক হাসাহাসি হলো। গল্পের প্রতিটি কথা আমার হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছিল। কোনোভাবেই নিজেকে সহজ ভাবতে পারছিলাম না। বাইরে থেকে আরো দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে মাসুদ ভাইকে বললাম– ঘরে খুব গরম, চলুন, পুকুরের সিঁড়ির উপর বসে সময় কাটাই।

কিছুক্ষণ বসার পর মাসুদ ভাইকে বিদায় দিয়ে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। ভাত দুবার মুখে দিতেই বমি বমি ভাব হতে লাগলো। উঠে পড়লাম। ফেরার পথে কামালের রুমে আর যাওয়া হয়নি। নিজের রুম খুলে প্রথমেই বেডে শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর উঠে আলো জ্বাললাম। তারপর খাতা-কলম নিয়ে লিখে চলেছি–

সবকিছু দিয়েছিলাম তোমাকে বাকি ছিল শুধু প্রাণ,
সামান্য কিছু ঘটনার মাঝে পেলাম তার মান।
ব্যথাহত এই বক্ষজুড়ে
বিস্মৃত ডুবুডুবু কথার ভিড়ে
হয়নি যখন হৃদয় আমার জীর্ণ,

ডেকেছিলাম তোমায় হাতের ইশারায়,
তাই তো তুমি হৃদয়ে দিয়েছিলে ঠাঁই,
জীবন হয়েছিল ধন্য।
শুনেছিলাম, তুমিও শুনেছিলে, ব্যক্ত করেছিলে মনের যত বাণী,
তৃপ্তি পাইনি, কখনও ফুরাইনি– এ অতৃপ্ত মনে সুর ছিল যতখানি।
বহু দিন বহু রাত ধরেও যদি বলতাম সে ভাষা,
ফুরিয়ে যেত দিন, সাঙ্গ হতো সবি, শুধু ফুরাতো না মনের আশা।
সে ভাষা ছিল সীমাহীন, সে কথা ছিল জুড়ে সমগ্র সিন্ধু,
আজকে তার হয়েছে অবসান, ভুলে গেছো সবি হে বন্ধু।
যে কথা শোনার অধিকার ছিল আমার আগে ভাগে একা আসি
সে কথা আজ শুনেছি বন্ধু সবার পিছে বসি।
হে বন্ধু! থাকতো যে সদা তোমার পাশে কিবা দিন কিবা রাত্রি।
আজ সেইখানে স্থান পেয়েছে দুরপনেয় সুদূরের অভিযাত্রী।
যে ছিল বন্ধু সবার চেয়ে আপন– স্বতঃস্ফূর্ত সদা, স্বতঃপ্রণোদিত,
সেই হয়েছে আজ সবার চেয়ে পর তাই তো উপেক্ষিত।
ছেড়ে যাওয়া সে তো বড় কিছু নয়, এ যে অতি ছোট কথা–
মনোডোরে বাঁধলেই যে কাঁদতে হয় এই তো বড় ব্যথা।
আজ তো আমার চলার পথ হারিয়েছি, পথের নেই কোনো ঠিক,
সে পথ গেছে ধূলিধূসরিত পথে– হয়েছি শ্রান্ত পথিক।
ভাবতে সে কথা অশ্রুতে হয়ে আসে সবি ঘোর,
ভাবি শুধু আপন কে আছে আমার পৃথিবী ভর?
তাই তো দেখি ক্ষণিকের বন্ধু পৃথিবী জুড়ে জীবনের কেউ নয়,
উত্তুরে বাতাস– সে তো মাঘ মাসে, ফাগুনে কি আর বয়?
কিন্তু বন্ধু সারাটা জনম মুছবে কি এই পরাজয়?
যখনই মনে হয় প্রাণ কেঁদে ওঠে, কেঁদে ওঠে হৃদয়।

লিখতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। সৌজন্য দেখাতে দেখাতে

মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় কিন্তু বন্ধুত্ব কখনো সৌজন্যে বিলীন হয় না। সৌজন্যই যদি চাইবো তবে শুধু কামাল কেন, অসংখ্য পরিচিতজন চারদিকে আছে। এটা একটা বিদ্যাপীঠ, মনে যা-ই থাক না কেন, ভদ্রতার খাতিরে হলেও ভালো ব্যবহার করার লোকের অভাব নেই। সৌজন্যে কামালের জুড়ি না মিলতে পারে কিন্তু বন্ধুত্বের জগতে সে একটা ননীর পুতুল। আমার ব্যথায় সে ব্যথা পাবে কী করে? হৃদয়ে মনুষ্যত্বের আসন যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে হৃদয় বেদনার কী বোঝে?

১৬.

বেশ রাত। দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে। পর পর দুবার। কান খাড়া করলাম, কে হতে পারে? উঠে গিয়ে খুলে দিলাম। দেখি, কামাল। সাথে আরো একজন, পাশের হলে থাকে, নাম শাহনেওয়াজ। ছোটখাটো নেতা গোছের, কামালের সাথে থাকে। আমিও তাকে ভালোই চিনি। নিজে সব সময় একটু ভাব নিয়ে চলে। একজন খাটে, একজন চেয়ারে বসলো। বিভিন্ন কথা কামাল বললো, সেও বললো। আমি শুধু উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। এক পর্যায়ে শাহনেওয়াজ আমাদের অঞ্চলে বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের কর্মকাণ্ড নিয়ে কথা উঠালো। তাদের হাতে অবৈধ অস্ত্রের ছড়াছড়ি, একথাও বলতে ছাড়লো না। দু-একটা অস্ত্র সেখান থেকে যোগাযোগ করে এনে দেয়া যায় কিনা দেখার জন্য অনুরোধ করলো। টাকা-পয়সা যা লাগে দেয়া যাবে, বললো। আমার কোনো ঝুঁকি নিতে হবে না, তাও বললো। শুধু যোগাযোগটা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে সে নিজে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, সে আশ্বাসও দিল। আমি সার্বিক অবস্থাকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম না, মেনে নিলাম। শুধু বললাম, যারা এসব কাজ করে বেড়ায়, যাদের হাতে অস্ত্র আছে, আমার সাথে তাদের যোগাযোগ একেবারেই নেই। তাছাড়া তারা আমার কাছে বেচতে রাজি হবে কিনা এটাও একটা ব্যাপার। সব মিলিয়ে আমি এসবের সাথে আমার সংশ্লিষ্টহীনতাই দেখালাম। সে বার বার বিষয়টা একটু ভালো করে ভাবার অনুরোধ জানিয়ে এবং আমার উপর তাদের আস্থা আছে এ বিশ্বাস জানিয়ে দুজনেই বিদায়

নিলো। আমি খাটের উপরই বসে রইলাম। এক কবির কথা কয়টা বার বার মনে পড়তে লাগলো, 'আমার মনের মতো মারাত্মক অস্ত্রটা তো আমি কারো কাছে জমা দিইনি।' মন যখন অস্ত্রে পরিণত হয়ে যায়, তখন অস্ত্র খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় না। অস্ত্রের তৃষ্ণা যেহেতু মনে জেগেছে, আমি চেষ্টা করে না দিলেও ওরা কোথাও না-কোথাও থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করবেই। ওদের পোষ্যপিতারাই ওদের অস্ত্র দেবে। আমার মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধের পর থেকেই অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখে আসছি, রক্তপাতের বিষয়টা দেখতে দেখতে গা সওয়া হয়ে গেছে। মনে তেমন দাগ কাটে না, মন স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। 'নিত্য মরাই কাঁদে কে' অবস্থা। তবে আজ কামালকে শাহনেওয়াজের সাথে এসে আমার সাথে এসব বলার কথা মনে হতেই গা শিউরে উঠলো। একেবারে হতভম্ব, হতশ্রদ্ধ হয়ে গেলাম।

এর সাথে রুনীর পরিণতির কথাটাও মাথা থেকে একেবারে ফেলে দিতে পারছিনে, ফিরে ফিরে আসছে। ভাবলাম, রুনীর সাথেও তো আমার দেখা করতে হবে। কী হচ্ছে, কেমন আছে, জানতে হবে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যেন চিন্তাহীন ঘুমরাজ্যে পৌঁছে গেছি।

পরদিন সকাল আটটা বেজে গেছে। তবু রুমেই বসে আছি। গ্রামের ছেলে। ছোটবেলা থেকে বেশ সকালে ওঠা অভ্যাস। সকাল আটটা মানে আমাদের গ্রামের চাষিদের এক বিঘা জমি প্রায় চাষ হয়ে যায়। আমারও পেটটা চোঁ চোঁ করছে। নাস্তা করার জন্য বাইরে বেরুলাম। বয়কে অর্ডার দিলাম– দুটো পরোটা একটা ভাজি। একটু পরে আবার বয়কে ডাকলাম– পরোটা দিসনে কেন রে? বয়টা কোনো উত্তর দিল না। আবার কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। চিৎকার করে উঠলাম– পরোটা হলো তোদের? আজ কথা শুনতে পাচ্ছিসনে কেন রে?

বয়টা কাছে এসে বিনয়ের সুরে বললো– স্যার, দেখুন না, প্রথম বারেই আপনার টেবিলে পরোটা দিয়ে গেছি। তবে কেন মিছেমিছি হাঁকাহাঁকি করছেন?

সম্বিত ফিরে পেলাম। লজ্জায় মাথাটা নত হয়ে গেল। মনে হলো হ্যাঁ তো, এ

পরোটা তো আমার টেবিলে অনেকক্ষণ ধরেই দেখছি কিন্তু কেনই বা বার বার সেই পরোটাই আবার অর্ডার দিচ্ছি! তবে কি কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে? কামালের রুমে গিয়ে দেখি কামাল নেই। মাসুদ ভাই বসে আছেন। জিজ্ঞেস করলেন– সুজন ভাই, নাস্তা করেছেন?

উত্তর দিলাম– করে এলাম।

উত্তর দিতে দিতে খাটের নীচ থেকে ধুলো পড়া একটা ট্রাংক বের করতে লাগলাম।

মাসুদ ভাই আবার জিজ্ঞেস করলেন– কোথায় নেবেন সুজন ভাই?

– আমার রুমে।

– কেন এখানে কি কোনো অসুবিধে হচ্ছে?

– না, এভাবে যাযাবর জীবন আর কতদিন কাটাবো? আর এ রুমে খুব গোলমাল, পড়াশোনার পরিবেশ নেই।

বলতে বলতে শেলফ থেকে কিছু বই বের করতে লাগলাম। একটা বয়কে ডেকে সব তার মাথায় তুলে দিলাম। মাসুদ ভাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

মাসুদ ভাই একবার বলে উঠলেন– কদিন থেকে দেখছি আপনার মুখে কোনো হাসি নেই।

রুমে বসে আছি। ভাবছি আজ বিকেলে রুনীর সাথে দেখা করতে যাব। দুপুর হয়ে গেছে, খেতে যাব। ঐ হোটেলটাতেই আবার খেতে গেলাম। মনের মধ্যে মাসুদ ভাইয়ের কথা কয়টা অনুরণিত হচ্ছে 'আজ কদিন থেকে দেখছি আপনার মুখে কোনো হাসি নেই।' আর থাকবেই-বা কী করে? এ পৃথিবীর যেদিকেই চোখ যায়, ফিরে তাকাই; দেখি একই বেদনার সুর, শুধু হাহাকার আর হাহাকার। কোথাও তো কোনো হাসির উপকরণ খুঁজে পাইনে– তো হাসবো কী দেখে? আনন্দ করবো কেমন করে? হোটেলের সামনে তেমাথার উপর জীর্ণ একটা কাপড় পরে এক বৃদ্ধ এই খর-ফাটা রোদে অবিরামভাবে বলে চলেছে– 'আল্লা একটা পয়সা দে।' কেউ তার

প্রতি করুণা পরবশ হয়ে পাঁচ পয়সা ফেলছে, আবার কেউ উপেক্ষার ছলেই চলে যাচ্ছে। ঐ যে আরেকজন সাহেব আসছে– হ্যাঁ, এদিকেই আসছে। বৃদ্ধটা ভাবছে– হয়তো পাঁচটা পয়সা পাবো। সাহেবের মচমচে জুতা, বিদেশী স্টাইলে পরা শার্ট-প্যান্ট কিছুই তার চোখে পড়ছে না, বৃদ্ধ তাকিয়ে আছে সাহেবের ডান হাতের দিকে– কখন জানি হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকায়। পকেটে হাত দিল। বৃদ্ধ ভাবছে– হয়তো পাঁচটা পয়সা বের করবে, ছুড়ে মারবে তার দিকে। কিন্তু না, একটু পরে দেখা গেল একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট বের করলো পকেট থেকে। সিগারেটের আবার আছাড়ি আছে। আছাড়িটা সোনালি রঙে বাঁধানো। হোটেলে উদরপূর্তি করে খেয়েছে, এখন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে তৃপ্ত করবে। দরকার নেই আর সাহেবের দিকে তাকিয়ে, শার্ট-প্যান্টের দিকে তাকিয়ে, বৃদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আবার তাকিয়ে আছে অন্যের পানে।

সামান্য পাঁচটা পয়সার জন্য এত আকুতি-মিনতি। মুখের দিকে তাকাতেই কেমন যেন মায়া লাগে। মনে হয়, নিজের যা কিছু আছে, অকাতরে সব ওকে ঢেলে দিই। ওকে এভাবে রোদে বসে একান্তভাবে কাতরাতে নিষেধ করি। আবার ভাবি, কীই-বা আমার এত আছে ওকে সন্তুষ্ট করার! আর আমার এ ক্ষুদ্র সম্পদ তো ওদের হাজারো অভাবের মুখে অতি নগণ্য। নিজে যতটুকু পারি সাহায্য করি। বেশি করে দিতে গেলে যে নিজের উপবাস থাকতে হয়; অনেক দিন তাও তো থেকেছি। কিন্তু ঐ যে অট্টালিকায় বসে যে সাহেবটা বিশ-পঁচিশটা টাকা নির্দ্বিধায় আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ধূম্র কুণ্ডলী করে চলেছে, ওদের কি চোখ পড়ে না এই নিরন্ন মানুষগুলোর দিকে? তাদের কি মন বলতে কিছু নেই? এমনই করে প্রতিটি রাস্তার মোড়ে, পথে-ঘাটে কত নিরন্ন মানুষ একমুঠো ভাতের জন্য পেটের জ্বালায় প্রতিনিয়ত কাতরাচ্ছে– কেউ কি তার হদিস করেছে? এমনই করেই সমাজ চলেছে– প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছি, নিজের কিংবা পোষ্যপুত্রদের পকেট ভারী হচ্ছে। গণতন্ত্রের কথা বলছি, ভোট গায়েব করছি, মানবতার সেবায় নিয়োজিত হব বলে প্রতিজ্ঞা করছি, সুজন ভাইয়ের কাছে অস্ত্রের খোঁজ খবর নিচ্ছি, আত্মজাহিরের বিজ্ঞাপনে অংশ নিচ্ছি কিন্তু নিজের চরিত্রের বদল তো করছিনে। তো এসব দেখে কেমন করে হাসি?

ছোটবেলায় অন্য গ্রামে ভাববাদী গোছের গান শুনতে যেতাম, তারা ভাবে তন্ময় হয়ে রামপ্রসাদির সুরে গাইতো, 'মক্কা, কাশি, শ্রীবৃন্দাবন/ মক্কা, কাশি, শ্রীবৃন্দাবন– অ-কা-র-ণ, ঘু-রে ঘু-রে ম-র-ণ। আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর ---।' ইত্যাদি। প্রশ্ন জাগে, এদেশে নেতা-নেত্রী, তদীয়পুত্র, তস্যপুত্রদের সে চরিত্র কোথায়, যে তারা একটা সুন্দর সমাজ গড়বে, দেশ গড়বে?

মাথাটা কেমন জানি ঝিম ঝিম করছে। চেয়ারে আর বসে থাকতে পারছিনে। অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ে রুমের বেডে এলাম। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

১৭.

বিকেলে রুনীর হলে গেলাম। রুনীকে খবর দিলে বেরিয়ে এলো। হলের সামনে অনতিদূরে ঘাসের উপর বসলাম। অনেক আলাপ হলো। এক পর্যায়ে রুনী কামালের কথা উঠালো। কামালের মনোভাব সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করলো।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম– এ কয়দিনে তুমি কতটুকু বুঝতে পারছো?

ও বললো– আমার সাথে প্রতিনিয়ত প্রতিটি কথায় তর্ক লেগেই থাকছে এবং তার কথায় ও কাজে মিল পাচ্ছিনে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কথা বলছে। সে অন্তর থেকে চাচ্ছে যে, আমি যেন স্বেচ্ছায় তার থেকে দূরে সরে যাই। তবে সেটা সে মুখ ফুটে বলছে না।

সে আরও বললো– ভাইয়া, আমি কামালের মনোভাব অনেকটা বুঝে ফেলেছি। এ কথা ভাবতে গিয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারছিনে। রাতদিন একই চিন্তা, মানুষ এত স্বার্থপর হতে পারে? সে যদি আমাকে গ্রহণ না করবে তো আমাকে আশা দিয়েছিল কেন? আমি তো যেচে তার কাছে যাইনি। সে আমাকে গ্রহণ করবে না, সেটা তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমার এ জীবনে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে গেছে। যে সেলিম আমাকে খারাপ কথা বললো, তার সাথে কামালের ইদানীং সম্পর্ক গভীর হচ্ছে।

কামাল সেলিমের কথাগুলো আমলেই নিল না। আমার মনে হয় কী জানেন? কামালই সেলিমকে দিয়ে এসব কথা আমাকে বলাচ্ছে। নইলে, সেলিমের এসব কথা বলার সাহস হয় কী করে? কামাল এখন আমার কাছ থেকে ওর চিঠিগুলো ফেরত নিতে চায়। আমি দিইনি।

ও বলে চললো– এখন আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? কামালের সাথে আমার এ সম্পর্কের কথা আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমনকি এলাকার অনেকের কানে কানে চলে গেছে। তাছাড়া, ক্যাম্পাসের অনেকেই আমাদের এ বিষয়টা জেনে ফেলেছে। কামাল ছাড়া আমি যে এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কিছু ভাবতে পারিনে। আমার ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ স্বার্থের জন্য এমন অন্ধ হয়ে যেতে পারে?

বলতে বলতে রুনীর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তবু তার কষ্ট, ক্ষোভ যেন শেষ হচ্ছে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার চোখ দুটো ফোলা ফোলা ভাব। হয়তো রাতের পর রাত ঘুমাচ্ছে না, একা-একা কেঁদে কেঁদে চোখ ভাসাচ্ছে। এর পরিণতি যে বড্ড মারাত্মক তা বুঝতে পারছি।

আমি রুনীর মুখের দিকে তাকিয়ে, এত কথা শুনে নিজেকে আর সংযত করতে পারছিনে। কষ্টে, ভাবাবেগে চোখের পানি টলটল করছে। একটু টোকা দিলেই হয়তো আষাঢ়ের বৃষ্টি নামবে। কখনো শক্ত হচ্ছি, নিজে ভেঙে পড়লে রুনীকে টিকিয়ে রাখবে কে? সান্ত্বনা দেবে কে? আমি যে রুনীর ব্যথায় সমব্যথী। সত্যিই মানুষ জীবনে এত স্বার্থপর হতে পারে? যদি এখানে আবার থাকি, হয়তো ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখবো কামাল খাচ্ছে; পাশের যে চেয়ারটাতে আমি বসতাম, সেটা শূন্য পড়ে আছে কিংবা অন্য কেউ দখল করেছে। হলে বিভিন্ন জায়গায় চলাফেরার সময় দেখা হয়ে যাবে। কিংবা কামালকে দূর থেকে দেখে সরে দাঁড়াবো অথবা তাকিয়ে দেখবো অতি পরিচিত মুখখানা কিন্তু কথা হবে না। আমি এড়িয়ে চলবো, সেও এড়িয়ে চলবে। হয়তো ঘৃণায় মনটা রে-রে করবে কিন্তু কেউ বুঝবে না। কামাল নিজেও জানতে পারবে না আমি তার সম্বন্ধে কী ভাবছি। কামাল দেখবে সুজন আছে, ভালোই আছে। শরীরে তো আর কোনো ক্ষত নেই, তাই কী করে বুঝবে মনে কত ব্যথা– কত আঘাত এ বুকে। এমনই করে দিন

চলে যাবে। মনটা শুকিয়ে যাবে, মরে যাবে, কিন্তু বাইরের কাঠামো ঠিকই থাকবে। ছিঁড়বে না, ফাটবে না– এ যে শক্ত বাঁধন, চামড়ার বাঁধন।

রুনী আমাকে বললো– ভাইয়া, এক্ষেত্রে কামালকে বুঝিয়ে পথে আনার কোনো ব্যবস্থা করা আপনার পক্ষে সম্ভব কিনা। ও তো আপনাকে অনেক আপন ভাবে। তাছাড়া আপনার কথার বাইরে ও যায় না। একটা কিছু করুন। আমি কিন্তু আপনার আসার অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম।

রুনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম– অত ভেঙে পড়ো না, একটু শক্ত হও। যে যেতে চায়, তাকে যেতে দেয়াই ভালো। জোর করে মন জয় করা যায় না। মনের বদলে মন পেতে হয়। তোমার মনটাকে যদি সে না বোঝে, তবে তুমি কীভাবে তাকে বোঝাবে, বলো? অপেক্ষা করো, সে কী করে, দেখো। তবে কামালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমি ও তুমি এ কবছর ধরে যা দেখছি, তাতে তুমি তার সাথে ঘর বাঁধলেও জীবনে কোনোদিন শান্তি পাবে না বলে আমার বিশ্বাস। তবে যেহেতু 'সময় থাকতে সাধু সাবধান' হওনি, এখন তোমাকেই সব ম্যানেজ করতে হবে। প্রতিজ্ঞা তোমারই করতে হবে, তোমাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, তুমিই পারো, তুমি তোমার জীবনকে জয় করতে পারো।

কথাগুলো যদিও বললাম, তবু মনের মাঝে যেন কত কথার আনাগোনা; আমি তো জানি কী হতে চলেছে, কী হবে। হৃদয়টা ব্যথায় ভরপুর। একবার মনে হলো হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে যেন সমস্ত কথা আজ রুনীকে খুলে বলি, নিজেকে উজাড় করে দিই। অথবা দুহাতে বুকটাকে কিছুক্ষণের জন্য খুলে ধরি– রুনী বুঝুক এ বুকে কত জ্বালা, কত ব্যথা জমাট বেঁধে আছে। বলার মানুষ পাই নি তাই বলা হয়নি। জানি, সব সত্য কথা সব সময় বলা যায় না, কখনো আত্মপ্রবঞ্চনা করতে হয়।

আসার সময় বললাম– স্বার্থের পাথর দিয়ে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত, হৃদয় দিয়ে তা তুমি কতক্ষণ সজীব রাখতে পারবে, তুমিই ভেবে দেখো? যে জেগে ঘুমায় তাকে জাগানো কি কখনো সম্ভব? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমরা এতদিন মরীচিকার পিছনে ছুটেছি। তুমি কি জানো, কামাল আমাকেও এড়িয়ে চলছে?

আমার শেষের কথাগুলো থেকে রুনী হয়তো তার বিষয়ে আমার অসহায়ত্বের কথা খুঁজে পাবে। হয়তো বুঝবে কামালের কাছে আমিও উপেক্ষিত।

রুনীর হল থেকে অনেক দূর চলে এলেও পিছু ফিরে দেখি, রুনী আমার দিকে তাকিয়ে হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে রুনী আজ বড্ড অসহায়। এ রকম একজন অসহায় বোনকে শ্বাপদসংকুল অনিশ্চিত পথের মাঝে ফেলে কোনো ভাই কি একা একা অন্য পথে চলে যেতে পারে? একজন বোনের জীবনের সব সাধ, আহ্লাদ, আকাঙ্ক্ষার কতটুকুই বা তার ভাই পূরণ করতে পারে! বড়জোর বৈষয়িক চাহিদার একটা অংশ মেটানো সম্ভব। কিন্তু মানসিক শান্তির কিছুই দেয়া সম্ভব নয়।

এমনই অনেক কথা ভাবতে ভাবতে পথে হাঁটছি। আসার পথে ভাবলাম, পাশের হলে বকুলের সাথে একবার দেখা করে যাই। আবার কবে দেখা হবে কি না হবে, বলা যায় না। বকুলের রেজাল্টও সেকেন্ড ক্লাস হয়েছে। সে সন্তুষ্ট। আমার রেজাল্টে সে দুঃখ প্রকাশ করলো। ইমপ্রুভমেন্ট দেয়ার পরামর্শ দিলো। দুজনে ওদের ডাইনিংয়ে রাতের খাবার খেলাম। বেশ রাতে নিজের রুমে ফিরলাম।

১৮.

রাতে শুয়ে চিন্তার জগতে চলে গেছি। মনের অবস্থা খুব খারাপ। যে কথাটা রুনীকে বলা হয়নি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে হয়তো ভর্তি হওয়া আর এখানে হবে না। আবার 'অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে' ছাউনি ফেলতে হবে নতুন পথের বাঁকে। এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। সে বিদায় হবে নীরবে, যাকে বলে নিভৃত প্রস্থান। কামালের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে– যা কোনোদিন চাইনি, তাই করতে হবে। মনে পড়ে সেই প্রথম যেদিন কামাল আমার ১০৪ নম্বর রুমে এসেছিল। কে জানতো সে দেখা এতদূর গিয়ে দাঁড়াবে– ইতিহাস হবে– জীবনের কাল হবে। যে কামালকে ভালো জেনে তার সান্নিধ্য পাবার আশায় নিজের হল ছাড়তে হয়েছিল, আজ সেই কামাল থেকে দূরে যাবার জন্য কামালের রুম ছাড়লাম, এখন হল ছাড়ার কথা ভাবছি। বার বার শরৎ চাটুয্যের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সেই কথা কয়টিই

মনের মাঝে উঁকি দিতে লাগলো, 'দেখিলাম বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, সে দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

বেশি ভাবছি রুনীর কথা। একটা ভুলের মধ্য দিয়ে যার সাথে পরিচয়, তাকে কেন দিনে দিনে এতো মায়াডোরে বাঁধলাম! তাকে তো আমি কোনো সহযোগিতাই করতে পারলাম না। রুনীকে আমি কী উত্তর দেব? শুধু স্মৃতির স্বাক্ষর হয়েই রয়ে গেলাম।

ভাবছি, রুনী একদিন ভার্সিটির এ পরিবেশ ছেড়ে বাড়িতে ফিরে যাবে। কামাল হয়তো তার এ প্রেমের মর্যাদা দেবে না। শত ব্যর্থতার মধ্যেও সংসার জগতে পা বাড়াবে। বুকের ব্যথা বুকে নিয়ে অন্য সংসারে যেতে হবে। সংসারে সংসারী সাজতে হবে, সন্তানের মা হতে হবে, কৃত্রিমতার আশ্রয় নিলেও স্বামীকে ভালোবাসতে হবে। হয়তো আষাঢ়ের বর্ষণমুখর দিনে স্বামী অফিসে চলে গেছে, কোলের ছেলেটাও ঘুমিয়েছে। নেমেছে বাদলের ধারা– চারদিক কোলাহলশূন্য, শুধু একই ধারা ঝিম ঝিম রবে ঝরছে। কাজ শেষে জানালা খুলে সুদূরে তাকিয়ে কোনো এক অজানা জগতে চলে যাবে। জানালার ধারে ফুলগাছগুলোকে মৃদু বাতাসে নাড়া দেবে। স্মৃতির জানালা খুলে যাবে। মনে পড়বে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা, ভার্সিটি জীবনের কথা, কামালের কথা, আমার কথা। ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যেতে চাইবে। বর্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চোখেও নেমে আসবে অশ্রুর ধারা। কিন্তু করার কিছুই থাকবে না। আমি তখন কোথায় থাকবো কে জানে! আমার জীবনের একতারার তারটি হয়তো ততদিনে ছিঁড়ে যাবে, তাই গান আর গাওয়া হবে না। জীবনের এ ছন্দ হয়তো থেমে যাবে, তাই কবিতাও আর লেখা হবে না। তবু রুনীর সেই অশুভ স্মৃতিশোকে কাতর মুহূর্তটিতে তাকে সান্ত্বনা তো আমাকেই দিতে হবে। সে কবিতাটাও আজকের এই বিদায়ের বেলাতেই লিখে যেতে হবে। হাতে কলম ধরেছি–

অনেক দিনের পরে কে গো তুমি কে একাগ্র মনে,
অতীতের স্মৃতি ভাবছো একা বসে বাতায়নে।
নয়ন হতে বয়ে চলেছে বিরহের অশ্রুজল,
সামনে দোলে ঘন মৃদু-উল্লাসে একরাশ ফুলদল।

মুছে ফেলো সে স্মৃতি, দূরে রাখো সে ভাবনা,
ভেবে দেখো একবার ভবিষ্যৎ, সামনে রয়েছে যাতনা।
নিভে গেছে যে দীপ তুমুল ঘূর্ণিঝড়ে,
জ্বালিও না আর রেখে দাও পাশে– একটি মনের আড়ে।
যে আশা করেছিলে তুমি সমগ্র হৃদয় ভরে,
ক্ষুণ্ন মনে শূন্য হাতে একা আজ চলেছো ফিরে।
থাকবে মনে এ জীবন ধরে, এ ব্যথা কি আর মুছবে!
এইভাবে একা বসে বাতায়নে কতদিন আর ভাববে?

১৯.

লেখা শেষে শুয়ে আছি। বেশ রাত হয়ে গেছে। দূর থেকে একটা পায়ের শব্দ করিডোর বেয়ে ক্রমশই নিকটে আসছে। হঠাৎ মনে হলো কামাল আসছে নাকি? রুম থেকে ট্রাংক, বইপত্র নিয়ে এসেছি, হয়তো আসতেও পারে। শব্দটা ক্রমান্বয়ে কাছে এলো। হিসেব করে দেখলাম– না, এ পদধ্বনি তো কামালের নয়। কামালের পদধ্বনি আমার অতি পরিচিত। শব্দটা একটু টানা টানা হবে– একটু আস্তে, এত দ্রুত নয়। পায়ের শব্দটা রুমের করিডোর পেরিয়ে চলে গেল। আবার একটা শব্দ এদিকে আসছে। কে, তা কে জানে? না, এ তো জুতার শব্দ, কামাল এলে পায়ে স্যান্ডেল থাকবে। কিন্তু ঐ তো দূরে আর একটা শব্দ এদিকে আসছে। হ্যাঁ, ঐ তো শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নিশ্চয়ই কামাল হবে; এ যে কামালের পদশব্দ– এই তো একেবারে কাছে চলে এসেছে। এখনই দরজায় ধাক্কা দেবে, ডাকবে– সুজন আছো? দরজা খুলে দাও। শব্দটা তো দরজা পার হয়ে চলে গেল। মনে হলো, তাহলে কামাল কি এই পথ দিয়েই গেল? আবার ভাবলাম, কামাল নাও হতে পারে। কামাল হয়তো আর আসবে না। হয়তো এতক্ষণ রুমমেটদের নিয়ে খোশগল্পে মেতেছে। হয়তো আমার কথা মনেই নেই!

খিদে পেয়েছে। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, একঘণ্টা ধরে আমি শুধু পায়ের শব্দ শুনছি। কত শব্দ যে শুনলাম, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

উঠে পানি খাব ভাবছি। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। প্রথমত, থমকে গেলাম। তারপর উঠে দরজা খুলে দিলাম। মাসুদ ভাই এসেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– সুজন ভাই, কেমন আছেন? আজ দুপুরের পর থেকে আপনি তো আর ঐ রুমে গেলেন না, তাই আপনি কী করছেন– দেখতে এলাম।

বললাম– দুপুর পর থেকে ব্যস্ত ছিলাম। কিছুক্ষণ আগে রুমে ফিরলাম। বকুলের ওখান থেকে খেয়ে এসেছি।

– পড়ায় মন দিন, আপনাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

– আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাছাড়া ওদিকেও বেশ কাজ আছে– যে কোনো সময় বাড়িতে চলে যেতে হতে পারে। আরও বললাম– এ হলে থাকাকালে আপনার মতো অনেক বন্ধু-বান্ধবের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার কথা কোনোদিনই ভুল হবার নয়। আশা করি আমার কোনো ভুল-ত্রুটি আপনারা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

উনি বললেন– আপনার মনের অবস্থা ভালো নয় তা বুঝি। এবার একটু ভালো করে পড়াশোনা করুন, নিশ্চয়ই একটা ভালো রেজাল্ট হবে। আমরা সে আশাতেই আছি।

আরো কিছু কথা বলে যাবার সময় উনি জিজ্ঞেস করলেন– আগামীকাল ডিপার্টমেন্টে যাবেন নাকি?

– এখনো বলতে পারছিনে, সময় আসুক। উত্তর দিলাম।

রাতে ঘুমাতে চেষ্টা করেছি। ঠিকমতো ঘুম হয়নি। সকালে উঠে বাইরের হোটেল থেকে নাস্তা সেরে এসেছি। আবার শুয়ে আছি। বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি। ট্রেনটা আসার সময় হয়ে এলো। উঠে প্যান্ট-শার্ট পরে নিলাম। বেডিংপত্র গুছানোই আছে। একটা বয়কে ডেকে তার মাথায় উঠিয়ে দিলাম, বললাম– স্টেশনে নিয়ে যা। আমি পায়ে পায়ে হলের গেটের দিকে আসছি। শরীরটা আর একেবারেই চলছে না, তবু ঠেলে নিয়ে চলেছি। চারদিক ঘিরে একই বেদনার সুর বেজে চলেছে– বিদায়, বিদায়, বন্ধু বিদায়! আর কোনো দিকে খেয়াল নেই। মাথা নিচু করে নিজের পথের দিকে চেয়ে আছি। কামালের রুমের দিকে একবার তাকালাম– রুমটা খোলা, হয়তো ভিতরে

কেউ আছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভাবলাম– 'তবুও সময় হলে শেষ, চলে যেতে হলো।' গেট পেরিয়ে কিছুদূর চলে এসেছি, পিছন থেকে ডাক শুনলাম– সুজন ভাই, একটু দাঁড়ান। দাঁড়ালাম। একটা ছেলে একটা চিঠি হাতে দিল– রুনী দিয়েছে। খামটা খুলে চিঠিতে চোখ রাখলাম–

ভাইয়া,
শ্রদ্ধাভরা সালাম নিবেন। আমি এসে আপনাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলাম, আসার জন্য। আপনি এসেছেন শুনে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার সাথে একদিনও দেখা করলেন না। অবাকই হলাম। বুঝলাম আপনি বন্ধুর সাথেই দেখা করতে এসেছেন। ইচ্ছে না থাকলে কারো কাছ থেকে কিছুই চাই না। জোর করে আপন হতেও চাই না। যে যা বলে সেই ভালো। সবাই আমার আপন। সম্পর্কের পার্থক্যে কিছুটা ব্যতিক্রম। আমাকে নিয়ে কাউকে চিন্তা করতে হবে না। আমার ব্যথার ভার আমাকেই তো বইতে হবে। আমার সুখ-দুঃখে অন্যের কী যায় আসে? ভোগ তো আমাকেই করতে হবে– সহানুভূতি না থাকলেও চলবে। আমি ভালো আছি। আপনাদের বন্ধুত্বের দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

'রুনী'

বুঝলাম গতকাল রুনীর সাথে দেখা হবার আগে কোনো এক সময়ে চিঠিটা লেখা। চিঠি পড়ে মনে কোনো রেখাপাত করেনি, একটুও ভাবিনি, আঘাতও পাইনি। শুধু একটা কথাই হৃদয়ে ঢেউ তুললো– তাহলে রুনীও শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুল বুঝলো? পাগলী বোন, কখন কী ভাবে, কী লেখে বোঝা দায়। জীবনের খুব কঠিন সময় সে পার করছে।

স্টেশনে এলাম। ট্রেনে উঠে বসলাম। স্টেশনের বুকস্টলের ক্যাসেট থেকে দরাজ গলায় গানের সুর ভেসে আসছে 'সর্বহারা হইলাম তবু, শেষ হইল না আশা। আবার আমি ঘর বান্ধিলাম সে ছিল দুরাশা-রে-এ, সে ছিল দু-রা-শা ---।'

গানটা সম্পূর্ণ শুনতে দিল না। ট্রেনের চাকাগুলো ঘুরতে আরম্ভ করলো– আমার জীবন চাকাও যেন ঘুরছে। চাকাগুলো ঘুরতে ঘুরতে ট্রেনটা স্টেশন ছাড়লো। তারপর সেই পরিচিত মাঠ, লাইনের দুপাশের বন, বনলতা ভাট,

আশ্যাওড়া গাছকে ছেয়ে রেখেছে। সেই পুরাতন কথা আবার মনে হচ্ছে– কাকে যেন এখানে হারিয়েছি, তাই আজ ট্রেনযোগে খুঁজতে খুঁজতে চলেছি। ট্রেন দুর্দম গতিতে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে– অতীতকে পিছনে ফেলে আমিও চলেছি– জীবনে কে কার! ব্যাগ থেকে খাতা-কলম বের করে লিখে চলেছি–

আমার নিজের গাঁথা যে মাল্যখানি
এনেছিলাম তোমাদের তরে–
ঠাঁই দাওনি, দাওনি তো আশ্রয়
লওনি তা গলে, ফিরিয়ে দিয়েছো
আজও ফিরিয়ে দিলে।
যদি এমনই কোনোদিন চৈত্রের তেজস্বী দুপুরে
যখন কাকেরা ডেকে ফেরে কা-কা রবে,
কাতরে মরে তেঁতুলগাছের মাথায়,
যখন দিনকানা পাখি ছায়া পাবার আশায়
এডালে-ওডালে ঝাপটা মারে–
আর ছায়া খুঁজে ফেরে।
তখন যদি তোমার ঐ বিছানায় শ্রান্ত
এলিয়ে-পড়া দেহটার পাশে এসে দাঁড়িয়ে
নীরবে মালাটা পরিয়ে দিই,
সেদিনও কি ফিরিয়ে দেবে আমায়, বলো?
যদি কোনো বর্ষার দিনে
পৃথিবীর এই রুক্ষ কঠিনতা পার হয়ে–
বাদল যখন গ্রাস করবে সমস্ত পৃথিবীকে,
সমগ্র আকাশে যখন চলবে মেঘের খেলা,
যখন কাকের ঐ কর্কশ রব আর থাকবে না
ঝিমাবে বসে নারকেল গাছের মাথায়।
বৃষ্টি যখন এই উত্তপ্ত পৃথিবীকে সিক্ত করে দেবে

ধুয়ে-মুছে দেবে সকল গ্লানিকে।
পাশের ডোবা হতে যখন ব্যাঙের আকুল কান্নার রোল
ভেসে আসবে কানে–
তখন তোমার ঐ আনমনা নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ পাশে
বৃষ্টিতে ভেজা হয়ে সিক্ত এ মালাখানি
যদি পরিয়ে দিই তোমার গলে
তবুও কি ফিরিয়ে দেবে আমায়, বলো?
তারপর দিনে দিনে একদিন থেমে যাবে
সকল নিষ্ফল আশা, ডুবে যাবে চাঁদ,
সূর্য আমার উঠবে না আর পূর্ব দিগন্তে,
দীপ আর জ্বলবে না এ দুঃখের মাঝারে।
সকল মিথ্যা চাপা পড়ে যাবে
সত্যের কঠিন শাসনে।
যখন আকাশে বাতাসে মর্মরে ধ্বনিবে
একই ক্রন্দিত সুর আমার এ অনড় দেহটাকে নিয়ে।
যখন বিদায়ের বাদ্য বাজবে নিখিল জুড়ে
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়ে বিষাদ সম।
তখন আমার ঐ নিষ্পলক-অচঞ্চল
এলিয়ে-পড়া দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে
যদি মনে পড়ে–
ফেলে আসা সেই কর্মমুখর দিনগুলোর কথা,
যা আছে স্মৃতিপটে বাঁধা হয়ে দুজনার।
সেদিনও কি পারবে ফিরিয়ে দিতে
আমার এ প্রীতিমাল্যখানি, বলো?

গাড়িটা এতক্ষণে একটা স্টেশনে এসে থামলো। আবার চলছে। আমি ভাবছি, রুনী যখন শুনবে আমি বাড়ি চলে গেছি, অথচ তাকে কিছুই বলিনি,

তখন সে বিষয়টাকে কীভাবে নেবে? কামাল আজ হোক আর কাল হোক জানবে আমি হলে নেই, কোথাও চলে গেছি– সে কী করবে? বাস্তব জীবনে গিয়েও কোনো এক অলস মুহূর্তে কি কামাল আমার কথা ভাববে? আবার খাতা-কলমের দিকে তাকালাম। মনে অনেক কিছু আসছে। জানিনে এ ভাষা আমার, নাকি অন্য কারো কবিতার অংশ। সব ভুলে একাকার হয়ে গেছে, তাই উদ্বৃতিচিহ্ন দিয়েই শুরু করলাম–

'ওগো নর ভুলে গেছ কি পূর্ব কথা?
ফেলেছ কি ডুবিয়ে বিস্মৃতির অতল সায়রে?
হেথা এক দরিদ্র পূজারী এসেছিল
তোমা সবাকার দ্বারে, তারে দূর করে দিলে
অনাদরে অপমানে।
হেমন্তের পাতা-ঝরা গোধূলি বেলায়
এমনি অবসন্ন সন্ধ্যায় যদি মনে পড়ে
সেদিন ফেলবে কি দুফোটা অশ্রুজল, বলো?'
আজ আমার শুধু এ দীন-মিনতি রাখো
আমার বন্ধুত্বকে তোমার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে গ্রহণ কর।

দাদুর কণ্ঠস্বর যেন ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। এতক্ষণে দাদুর চোখে যেন অশ্রুর বান ডেকেছে। সে স্রোতে জীবনের ফেলে আসা সকল দীনতা হীনতাকে তুচ্ছ করে সকল গ্লানিকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে আজ সাগরে ফেলবে।

আমি বললাম– দাদু, চাঁদ যে আর দেখা যায় না, রাত হয়তো শেষ হয়ে এসেছে।

টুটুন বললো– দাদু, তারপর?

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ (১৯৮৮)

জন্ম ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮, চুয়াডাঙ্গা জেলার দত্তাইল-শম্ভুনগর গ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বি.কম. (অনার্স) ও এম.কম.। বি.আই.এম. থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। আই.সি.এম.এ.বি. থেকে সি.এম.এ. এবং বর্তমানে একজন এফ.সি.এম.এ.। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে পিএইচ.ডি.। ইউরোপিয়ান কমিশনের এরাসমাস মুন্ডুস স্কলার হিসেবে করভিনাস ইউনিভার্সিটি অব বুদাপেস্ট থেকে কর্পোরেট গভার্নেন্স বিষয়ে পোস্ট-ডক্টরেট।

তেত্রিশ বছর ধরে তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত ইন্সটিটিউট, কলেজ, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা, শিক্ষা-প্রশাসন এবং গবেষণার কাজ করে আসছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।